লুৎফর রহমান রিটন

# সেরা কিশোর কবিতা

আলোকিত মানুষ চাই

# লুৎফর রহমান রিটন
# সেরা কিশোর কবিতা

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

SEQAEP

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৫০

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

চতুর্থ সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলংকরণ
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0149-3

# ভূমিকা

১

আমার এক লেখক-বন্ধু একবার, ষাটের দশকে, কিশোর-উপযোগী একটা সুখপাঠ্য বই লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁকে শিশুসাহিত্যের ব্যাপারে আরো খানিকটা উদ্বুদ্ধ করার জন্য আন্তরিক উৎসাহ থেকে একদিন শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সম্পন্নতাগুলো তাঁর সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। ফল হয়েছিল বিপরীত। আমার উৎসাহে তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। আমার কথা শেষ হলে বিমর্ষ গলায় হতাশা ফুটিয়ে বলেছিলেন, আমাকে তুমি শিশুসাহিত্যিক হতে বলছ!

মাইকেল মধুসূদন দত্তও অদ্ভুতভাবে মনে করতেন যে, গীতিকবিতা লিখে তাঁর পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব নয়, অমর হতে হলে তাঁকে মহাকবি হতে হবে। তাই তিনি মহাকাব্য লেখায় হাত বাড়িয়েছিলেন।

আমাদের চারপাশের প্রায় সব কবির মতো হয়তো আমার সেই কবিটিরও ধারণা ছিল যে সাধারণের জগতে টিকে থাকতে হলে কবি হয়েই কেবল তা সম্ভব। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-নাটক বা শিশুসাহিত্যের অর্থহীন আয়োজনে তাঁর সম্ভাবনা নেহাতই ক্ষীণ, এমনকি ভালো লিখলেও। এমনটা যাঁর ভাবনা তাঁর কাছে শিশুসাহিত্যে ভাগ্যান্বেষণের প্রস্তাব এলে গলায় নৈরাশ্যের সুর ফুটে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমার ঐ কবি-বন্ধু একটু ভালো করে পর্যালোচনা করলেই টের পেতেন যে কাব্যদেবীর বন্দনা কোনো কবির অমরত্বের যেমন নিঃশর্ত গ্যারান্টি নয়, তেমনি শিশুসাহিত্যের মতো সাহিত্যের অন্য শাখাগুলোও যে যশোপ্রার্থীদের দীর্ঘায়ুর দরজা থেকে পত্রপাঠ বিদায় করে তা-ও নয়। পৃথিবীর এ-যাবৎ কালের কোটি কোটি কবিযশপ্রার্থী যেমন বিস্মৃতির নিষ্পত্র জগতে হারিয়ে গেছেন তেমনি শিশুসাহিত্যের অসংখ্য শক্তিমান স্রষ্টা মানব-স্মরণে অমর জায়গা পেয়েছেন। হ্যান্স ক্রিশ্চান এন্ডারসন বা লুই ক্যারল, অস্কার ওয়াইল্ড বা মার্ক টোয়েন তাঁদের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় যে অনুপম স্বপ্নজগৎ রচনা করেছেন, সে-সবের শিল্প-সিদ্ধি পৃথিবীর হাতে-গোনা গুটিকয় শ্রেষ্ঠ কবিকে বাদ দিলে ক'জনার চাইতেই-বা খাটো?

*মেঘনাদবধ কাব্যে* মাইকেল কাব্যদেবীর আবাহনের পরপরই বন্দনা করেছেন কল্পনাদেবীকে :

—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাব্য রচনায় হাত দিয়ে তিনি টের পেয়েছিলেন যে বাকদেবীর দুর্লভ আনুকূল্য কবিতার দুঃসাধ্যের যাত্রায় তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে ভরসা যোগালেও যা তাঁর নিয়তির সামনে

'উজ্জ্বল উদ্ধার' হয়ে দেখা দেবে, তাঁর চিত্ত-ফুলবন-মধু দিয়ে নিরবধিকালের জন্য অত্যাশ্চর্য মৌচাক রচনা করতে পারবে তার নাম কল্পনা। এই কল্পনাই তাঁর সম্পন্ন বক্তব্যকে ছবি আর গানের বর্ণোজ্জ্বল জগতে—ধ্বনিময় চিত্রলোকে—স্মরণীয় জায়গা দেবে।

এই কল্পনা যাকে স্পর্শ করে তার নামই শিল্প—অনুপম, অশ্রুতপূর্ব ও অপার্থিব। কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য এমনকি প্রবন্ধ—যা-ই এর হিরণ-ত্বকের স্পর্শ পায়, তাই সোনা হয়ে যায়। এখানে ছেঁড়াছাতা আর রাজছত্রের মতো, আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানির মতো, কবিতা আর শিশুসাহিত্যের কোনো ভেদ নেই। কল্পনার দীপ্তিতে সম্পন্ন হলে এরা একইরকম চিরন্তন।

যে সম্পন্ন কল্পনা ছড়া বা শিশুরচনাকে শিল্পের টোপর পরায়, কবিতাকেও তাই জ্বলিত করে অলীক সৌকর্যে। গড়নে, অবয়বে, শিল্প-স্বভাবে ও ভেতরের তাগিদে ছড়া আর কবিতা তো একই জিনিস। তাই বলে ছড়া বা শিশুরচনা আর কবিতাকে কি হুবহু এক বা সমমাপের জিনিস বলতে পারব? না, তা পারব না। অনেকদূর পর্যন্ত ছড়া বা শিশুকবিতা কবিতার সহযাত্রী হলেও মনে রাখতে হবে ছড়া শেষ অবধি কেবলই শিশুরই কবিতা, তার অসম্পূর্ণ উদ্ভট অবিকশিত জীবনের স্বপ্ন ও সত্য। এই জগৎ অনেকটাই খাপছাড়া—স্বপ্নে দেখা পৃথিবীর মতো পারম্পর্যহীন। পরিণত মানুষের জীবনবোধ, গভীরতা, বহুমুখিতা, উত্থান ও অবসানের প্রগাঢ় পদাবলী কী করে আসবে ছড়ায়? শিল্পের সর্বোচ্চ সিদ্ধিকে, গভীরতম উপলব্ধি বা রক্তক্ষরণকে কী করে স্পর্শ করবে সে? কিন্তু সর্বোচ্চ শিখরকে স্পর্শ না-করলেও একটা উঁচু চূড়া পর্যন্ত ছড়া তো কবিতাই। শিল্প-সাফল্যের জন্য কবিতার মতো হুবহু একই শর্ত পূরণ করে ছড়াকেও তো এগোতে হয়।

আগেই বলেছি কবিতার সঙ্গে ছড়ার পার্থক্য প্রকরণের নয়, প্রসঙ্গে; আধারে নয়, আধেয়তে। ছড়াকার মানুষের সমগ্র জীবনের কবি নন—তাঁর জীবনের শিশু অংশের কবি। শৈশব-কৈশোরের পর তাঁর এলাকা শেষ হয়ে যায়, কবি এসে দায়িত্ব বুঝে নেন। পরবর্তী পুরো জীবনটার তিনিই রূপকার। জীবনের এই দুটি পর্বের স্বভাব আর মতিগতি আলাদা বলেই কবি আর ছড়াকার আলাদা। নইলে জীবনকে জ্বলিত করার উপকরণ আর উপাচারে এরা দুজনেই এক।

দুজনেরই কারবারের মূল পুঁজি সেই দুই আদি অকৃত্রিম জিনিস : শব্দ আর ছন্দ। কবির মতো ছড়াকারকেও জীবনের কোনো একটা আবেগাশ্রিত বিষয়কে ধ্বনিময় চিত্রলোকের বিস্মিত বাসিন্দা করে তুলতে হয় কল্পনা ঐশ্বর্যের সমান সচ্ছলতা দিয়ে—কবিত্বেরই শক্তি দিয়ে। এখানে কি কেউ কারো চেয়ে কম? 'লুকোচুরি', 'বীরপুরুষ', 'একদিন রাতে আমি', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' রচনাগুলোয় রবীন্দ্রনাথ চিত্রজগৎ, ধ্বনিজগৎ বা ভাবনাজগৎ রচনার কল্পনায় কোনখানে কম তাঁর কবিতার অন্য এলাকাগুলোর চেয়ে? নজরুলের 'খুকি ও কাঠবেড়ালি' কবিতায় শিশুমনের যে করুণ লুব্ধ অসহায়তা আর্ত হয়ে উঠেছে কবিতা প্রতিভার নিরিখে তাকে ক'টা কবিতার চেয়ে হীন বলা যাবে? সুকুমার রায়ের 'ছায়াবাজি'তে যে কবিত্বের প্রমাণ মেলে বাংলাসাহিত্যে ক'টি কবিতা তার সমান মাপের?

ছড়াকারকে আমি তাই 'কবি' নামে ডাকতে পারলেই খুশি। ছড়াকার সুকুমার রায়কে 'ছড়াকার' না বলে বলতে চাই 'কবি সুকুমার রায়'। মহাকাব্যের কবি, গীতিকাব্যের কবি, প্রকৃতির কবি, প্রেমের কবি, সবাই যদি কবি হতে পারেন, তবে শিশুর কবির 'কবি' হতে আপত্তি কোথায়।

আগেই বলেছি শিশুর কবি মানুষের জীবনের শৈশবপর্বের কবি, শিশুর হৃদয়ের ঈপ্সা আর বাস্তবতার কবি। শিশুর স্বপ্ন-লোভ-কামনা ও আকাঙ্ক্ষার জিনিসগুলোকে তার কবিতায় স্বাদে-গন্ধে জীবন্ত করে তুলতে হয় তাকে, না হলে শিশুর রসনায় তা ঠিকমতো রোচে না। শিশুর জগৎটি ঠিক কেমন, এবার তা শিশুর কয়েকটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলতে চেষ্টা করা যেতে পারে।

পৃথিবীর অরণ্যচারী আদিম মানুষদের মতো শিশুরাও এক অবারিত কল্পনা-জগতের অধিবাসী। তার ইচ্ছা-রঙিন 'যা খুশি তাই'-এর পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা'র অলীক বাগানে ক্ষিপ্র চটুল কাঠবেড়ালির মতো তার ইতিউতি ছোটাছুটি। এ-কারণেই আমাদের এই ধরাবাঁধা নিয়মের পৃথিবীটা তাকে পদে পদে রক্তাক্ত করে, ক্ষত-বিক্ষত করে। বাস্তবের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে পৃথিবীতে সে উদ্ধারহীন আর যন্ত্রণাকাতর একটা জীবন কাটায়। যুক্তির জগৎ তার অপরিণত, কাঁচা মনটার ওপর হত্যাকারীর মতো চেপে বসে থাকে। এর অত্যাচারে সে আর্তনাদ করে। এ-কারণেই নিয়মের জগতের সামান্যতম বিপর্যয় বা পদস্খলন তাকে উৎফুল্ল করে, আশান্বিত করে। নিয়মহীনতার স্বেচ্ছাচার তাই শিশুর শক্তি আর আনন্দের আকুতি। এ জন্যেই শিশু যখন দেখতে পায় তার চোখের সামনে, হোক সে স্বপ্নে, ভারি ভারি ইট-কংক্রিটে গাঁথা দানবীয় বিশাল কলকাতা শহরটা তার শ্বাসরোধকারী শান-বাঁধানো দাপট হারিয়ে হঠাৎ পাগলের মতো দৌড়োতে শুরু করেছে তখন এক অপার্থিব উল্লাসে তার মনটা ভরে যায়। এমনই তো সে দেখতে চায় এই জগৎটাকে— এমনি সবকিছু ছুটি পাওয়া ভেসে-যাওয়া অবস্থায়। নিয়ম আগল ভাঙা স্বেচ্ছাচারী জগৎ শিশুর অবিকশিত কচি মনটার খুব কাছাকাছি। সেই জগতে সে স্বস্তি বোধ করে। পরিণত মানুষের বুদ্ধি বা বিচার-বিবেচনা গড়ে ওঠেনি বলে কেবলমাত্র হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া দিয়েই সে জীবনের যাবতীয় দেনা শোধ করতে চায়। তাই নিয়ম-বাস্তবহীন 'যেমন খুশি তেমন'-এর বাড়াবাড়িতে সে তার রুপোর গাছের অলীক হীরে ফলটিকে পেয়ে যায় ভারি অনায়াসেই। এই জন্য সম্ভাব্যতার সবরকম সীমানা পেরিয়ে 'বীরপুরুষ' কবিতায় অসহায় খোকা যখন তেপান্তরের মাঠে একা বিরাট দস্যুদলকে হারিয়ে মায়ের পাশে এসে বীরের মতো দাঁড়ায়, তখন সেই গল্প পড়তে গিয়ে গর্বে আর আত্মবিশ্বাসে তার মন ভরে যায়, তৃপ্তির আনন্দাশ্রুতে চোখ ভিজে ওঠে।

এই যুক্তিহীন অবাস্তবতার জগৎই শিশুর জগৎ। এই জগৎকে যে কবি সুস্বাদু খাবারের মতো স্বাদে গন্ধে মুখরোচক করে তার টেবিলে পরিবেশন করতে পারবেন তিনিই তার কবি। শিশুমনের হয়তো সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এটিই—যুক্তির এই সার্বভৌম বিপর্যয়। ঐ ব্যাপারটা তার গড়েই ওঠেনি—শিশুর সঙ্গে পরিণত মানুষের মূল তফাতটা এটাই। তার মাথায় অভিজ্ঞতা জগৎ এখনো দানা বাঁধেনি, বুকে জমে ওঠেনি 'আকীর্ণ ধূসর পাণ্ডুলিপি'। শিশুর কবিকে হতে হয় শিশুমনের এই যুক্তিহীনতার প্রতিভাবান লিপিকর।

কিন্তু এ-ছাড়াও আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে একজন শিশুর। শিশুদের ভেতরে রয়েছে সুস্বাদু খাবারের প্রতি দুরপনেয় লোভ; পরিণত মানুষদের তুলনায় হয়তো বেশিই রয়েছে। তাদের শিশুত্বের মতোই ঐ লোভ স্বাস্থ্যবান আর সজীব। খাবারদাবারের কথামাত্রেই শিশুর রসনা অজান্তে সজল হয়ে যায়; চেহারা করুণ আর অসহায় হয়ে

ওঠে। উষ্ণ তপ্ত পরিচর্যায় তার এইসব স্বাদেন্দ্রিয়ের, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি ঘটাতে হবে শিশুর কবিকে, না-হলে তিনি শিশুর মনে আসল মানুষটি হতে পারবেন না।

শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ?
টক টক থাকে নাক হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'টক টক গন্ধ' পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার রসনায় যে সজীবতা দেখা দিয়েছিল শেষ পঙ্‌ক্তিতে আসার পর তা পুরো সক্রিয় হয়ে উঠল। এক আকাশ মাধুর্য চেটে দেখার আস্বাদে তার জিভ ততক্ষণে ভিজে সারা। কাব্যরসের আড়াল দিয়ে খাদ্যরসের বিস্তার তাকে এই কবিতার আরো নিমগ্ন পাঠক করে তুলেছে।

টক, ঝাল, ভাজা-পোড়া বড় প্রিয় শিশুর। 'চিনে বাদাম ভাজে' বা 'চানাচুরগরম' জাতের কথাগুলো কানে আসতেই তার ইন্দ্রিয়জগতে যেন তোলপাড় পড়ে যায়। সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে একটা জবরজং মুখরোচক পৃথিবী এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। এইসব খাদ্যরক্তিম জগতের বর্ণনা তুলে ধরে শিশুর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রসনা জগৎকে তরতাজা রাখতে হয় শিশুর কবিকে। তাই 'ছায়াবাজি' কবিতায় সুকুমার রায়কে নানাজাতের ছায়ার কথা বলতে গিয়ে এক ধরনের ছায়ার বর্ণনা দিতে হয়েছে এভাবে : গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া ভীষণ রোদে ভাজা।

'ভীষণ রোদে ভাজা'—শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয় একসঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। 'ভাজা' শব্দটি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর রসনাপরায়ণ চোখ নিজের ঈপ্সিত ভুবন যেন খুঁজে পেল সামনে। শিশুর কবি বলেই শিশুর সামনে তার রসনার জগৎকে এমন জীবন্ত করে তুলতে হল কবিকে। সুকুমার রায় পরিণত মানুষের কবি হলে কবিতার রূপটি হয়তো তিনি খুঁজতে চাইতেন খানিকটা আলাদা উপমায়। খুব বেশি জীবনানন্দীয় হলে হয়তো ভাজার জায়গায় 'ভেজা' শব্দটা ব্যবহার করতেন তিনি। দুপুরের ছায়ার একটা সজল মধুর ছবি ফুটিয়ে তুলতে উৎসাহী হতেন।

শিশুর ভেতর রয়েছে এক দুর্দান্ত ও আদিম শক্তিমত্তা। তার শারীরিক যোগ্যতা নির্জলা, অফুরন্ত ও নৈসর্গিক। এই শক্তির প্রাচুর্যে তার স্বগোত্রের পরিণত সভ্যদের চেয়ে সে ভাগ্যবান। জেগে থাকার মুহূর্তগুলোয় সে অদম্য কর্মমুখর, নিদ্রায় সে পরিপূর্ণ ও নিখাদ। কিন্তু যে শক্তিতে সে আর সবার চেয়ে বড় তা হল বিস্ময়ের শক্তি। পৃথিবীর ঘরে নতুন এসেছে সে। প্রতিটা বস্তুকে সে তাকিয়ে দেখছে প্রথমবারের মতো। দেখে দেখে বিস্ময়ের শেষ খুঁজে পাচ্ছে না। কেউ আজো তার সরল বিশ্বাসের বুকে হঠকারী ছুরি বসায়নি, জাগতিক প্রতারণা গুঁড়িয়ে দেয়নি হাড়। মিথ্যা বা ভুলের সঙ্গে আজো সে অপরিচিত। কোনো কিছুকে যাচিয়ে খতিয়ে সন্দেহ করে দেখার মোহহীন চাউনি আজো তাকে অধিকার করেনি। সাত ভাইয়ের সাতটি চাঁপা ফুল হয়ে গাছের ডালে ফুটে-থাকা পারুল বোনের সঙ্গে কথোপকথন, রাক্ষসের তাড়া খাওয়া নিরাশ্রয় রাজপুত্রকে 'সত্য গাছে'র দু'ভাগ হয়ে নিজের ভেতর নিয়ে নেওয়া, তারপর ক্রমে তাকে ফলে পরিণত করে রাক্ষসীর অলক্ষে পুকুরের পানিতে ফেলে দেওয়া, দুধের সাগর ক্ষীরের সাগরের মাঝখানে আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা গজমোতির হার মাথায় ক্রীড়ারত হাতি—সবকিছু তার কাছে সত্যি আর বিশ্বাসযোগ্য। কোনো কিছুতেই তার অনাস্থা নেই। যাকেই সে বিশ্বাস করে,

তা-ই একপ্রস্থ পাতলা কাগজের ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে ছিঁড়ে ফেলার উল্লসিত অকারণ ধ্বনি। শিশুর জগৎ তাই পুলকের জগৎ। অকারণ অনাবিল এক পুলকের পৃথিবী। বাস্তবতা বা পতনের সঙ্গে অপরিচিত বলে শিশুর জগতে বেদনার পদচারণা বেশ খানিকটা সংকুচিত। তার দুঃখের পৃথিবী চেতনা-জগতে সুদূরপ্রসারী হলেও উপস্থিত মূল্যে স্থূল ও ছোট—শারীরিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই তার বসবাস। পরিণত মানুষের আত্মধ্বংসী অভিঘাত তার ভেতর ক্রিয়াশীল নয়। তার দুঃখ তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নিম্নমাত্রার দুঃখ'। এজন্যে অদ্ভুত রসের পাশাপাশি শিশুর জীবনের অন্যতম প্রধান রস কৌতুকরস। পরিণত মানুষ এখানেই শিশুর থেকে পৃথক। তার জীবনের প্রধান বিষয় বিষাদ। তাই শিশুর মতো তার মূল রস কৌতুক নয়, করুণ। এজন্যই Our sweetest songs are those that tell of saddest thought—পরিণত মানুষের জীবনের গভীরতর সত্য।

প্রগাঢ় বেদনাকে উপজীব্য করে বলে পরিণত মানুষের কবিতা মহত্ত্বের যে শীর্ষকে স্পর্শ করতে পারে শিশু-কিশোর কবিতা তা হয়তো পারে না, কিন্তু রহস্য-পরিহাসমুখর আস্বাদ উপভোগের যে রঙিন ও চটুল পৃথিবী শিশু-কবিতায় রচিত হতে পারে তা অতুলনীয়। পরিণামজ্ঞানহীনতার কারণে শিশু গাঢ় দুঃখকেও অনাবিল উপভোগের বিষয় করে তুলতে পারে, এমনকি গভীরতম দুঃখকেও।

লুৎফর রহমান রিটন শিশুমনের এই সবক'টি প্রবণতারই খবর কমবেশি রাখেন। এই জন্যে জীবনের ছোট ছোট হাজারো বিপর্যয় আর অসঙ্গতিকে তিনি তাঁর ছড়ার মুখরোচক প্লেটে সাজিয়ে শিশুমনের সামনে হাজির করতে পারেন। বড় মানুষদের ফাঁদে-পড়া জীবনটার কৌতুককর দুরবস্থা দেখে অনাবিল হাসিতে গড়িয়ে পড়তে শিশুদের অসুবিধা নেই। কারো কোনো হঠাৎ বিপদ, আছাড় বা মার খাওয়ার দৃশ্য, শিশুরা, তাই অমন নির্জলা উপভোগ করে।

হোটেলে ঢুকেই চ্যাঁচালেন তিনি
আন দেখি বেটা বিরিয়ানি!
হোটেলের বয় সবিনয়ে কয়—
দ্যান ট্যাহা দ্যান, বিড়ি আনি।

রেগে কন তিনি আন দারুচিনি
সাথে ওয়াটার ঠাণ্ডা।
মাথা চুলকিয়ে বলে বয় ইয়ে...
কই পামু সাব আণ্ডা?

মেজাজটা তার সপ্তমে ওঠে
রেগে কন ব্যাটা বেয়াকুব?
তবু সেই বয় বিচলিত নয়
বলে স্যার, আমি এয়াকুব!

এখানে হোটেলের অবিচলিত বয় এয়াকুবের শ্রবণশক্তির ত্রুটি একটা পরম উপভোগের ব্যাপার হয়ে উঠল শিশু-কিশোরদের কাছে। কিংবা সেই খাই খাই করা আব্দুল হাই, খাই খাই-এর সঙ্গে মিল দিতে গিয়ে যার নাম হাই হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, যে মানুষটি আম-জামের সঙ্গে টিভি প্রোগ্রাম খাওয়ার পর হাসি, খুশি, ভুসি এমনকি ঘুসি খেয়েও

তাকে দেখেই তার বিস্ময়। 'এমন অদ্ভুত সব জিনিস দিয়েই এই জগৎ তৈরি তাহলে'— আবিষ্কারের খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ভাবে সে। ভেবে অবাক হয়।

আচার্য জগদীশ বসু
উদ্‌ভিদ্‌কে বলেছেন পশু।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদকে জলজ্যান্ত পশু হয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখছে সে চোখের সামনে। আরে, না হেঁটে কি পারে! আচার্য জগদীশ বসু তাদের পশু বানিয়ে দিয়েছেন না! এমনি সজীব বিস্ময়ের শক্তিতে উজ্জ্বল তাদের জগৎ। বাড়ির কাছে গরমের ছুটির সময়কার নিশ্চুপ তালা লাগানো বিশাল কলেজ ভবনটাকে দেখে সে সহজেই ভেবে বসতে পারে—এই সেই রূপকথার ঘুমন্ত রাজবাড়ি, যেখানে হাতিশালে হাতি ঘোড়াশালে ঘোড়া ঘুমায়, সিংহাসনে ঘুমায় রাজা আর রানী, চারপাশে পাত্র-মিত্র সভাসদ সিপাহী সান্ত্রী— সব এক কাব্যময় ঘুমের ভেতর অপরূপ হয়ে ফুটে থাকে। বাড়ির পেছনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে তার ঝোপঝাড়ের আড়ালে তেপান্তরের উল্কি আঁকা ডাকাতদের ঘাপটি মেরে বসে থাকার কথা মনে হয়। শিশুর জগৎ 'নেই মানা'র জগৎ। আকাশ এর সীমা।

শিশুর কবি শিশুমনের এইসব বিস্ময়ের কবি, নিয়ম-আগল-উধাও করা তার যুক্তিহীন পৃথিবীর রূপকার। তার এইসব অসম্পূর্ণ ভাঙাচোরা উদ্ভট কামনা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের নিরন্তর যোগানদার। শব্দে, ছন্দে, ছবিতে, গানে, সম্পন্ন কল্পনায় ও বিরল সৌকর্যে শিশুর পৃথিবীকে শিশুর সামনে রংদার করে তাঁকে তুলে ধরতে হয়।

৩

লুৎফর রহমান রিটনের শিশু-কিশোর কবিতায় যে দিকগুলো আমাকে তাঁর ব্যাপারে আশান্বিত করে তার একটি হল শিশুর হৃদয়ের চাওয়া-পাওয়ার একটা ভালোরকমের খবরাখবর তিনি রাখেন। 'বর্ষশেষ' কবিতায় 'নতুন'কে বিশেষিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, আপাতভাবে সরল নিষ্পাপ মনে হলেও নতুন আসলে নিষ্ঠুর। ['হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন। সহজ প্রবল।'] আগেই বলেছি, শিশুর ভেতরেও রয়েছে এমনি এক সরল অতন্দ্র নিষ্ঠুরতা। 'নতুন' বলেই, জীবনের কঠিন বাস্তবে জেগে ওঠেনি বলেই, এই নিষ্ঠুরতা। রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের শুরুতে শিশু-কিশোর বয়সের এই নিষ্ঠুরতার অনাবিল রূপটি অনন্য :

'বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটি নতুন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ আবশ্যক, কালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ-প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।'

আমি ফটিক আর তার সঙ্গী বালকদের নিষ্ঠুর না বলে জড় বলতে পারলেই বেশি খুশি হব। পৃথিবীর শিশুরা এদের মতোই জড় ও অবোধ। তাদের এই মূঢ়তা সকালবেলার আলোর মতোই অনিন্দ্য। এক জরাহীন, বেদনাহীন, চিরনবীন জগতের বাসিন্দা তারা। বয়স্ক পৃথিবীর দুঃখগুলোও তাদের কাছে খুশির। আমাদের কাছে যা পতনঘটিত মৃত্যু-আশঙ্কা, তার কাছে তাই তেতলার কার্নিশের ওপর দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা দুদ্দাড় দাবড়ে বেড়ানো। আমাদের কাছে যা কবিতার প্রিয়তম পাণ্ডুলিপির মর্মান্তিক দুর্দশা শিশুর কাছে

নির্বিকার এবং এক পর্যায়ে বাড়ি-গাড়ির সঙ্গে পুলিশের ফাঁড়ি খাওয়ার সুবাদে মাঝে মাঝে লাথি খাওয়ার ভাগ্যও পাকা করে নিয়েছে, তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার দিগ্বিদিকহীন ব্যগ্রতা শিশু-কিশোরদের বড় বড় চোখগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য অবাক করে রাখে। কিংবা নিজের নাম ভুলে-যাওয়া বিমর্ষ ভোলারাম, বাংলা এবং অঙ্কে একই রকম কাঁচা ভোম্বল, রাগী 'বাবার বাবা'র হাতে ছেলেবেলার 'বাবা'র হেনস্তা হওয়ার প্রিয় উপভোগ্য কাল্পনিক দৃশ্য বা নিধিরাম মিত্রের আঁকা সেই ছবিটা যা দেখে কেউ বলছে ও ছবি পেত্নীর, কেউ বলছে হায়েনার, কেউ বলছে গরুর বা ছাগলের 'নয়তোবা হাইজাম্প পাগলের'—কিন্তু শেষে নিধিরাম মিত্র নিজেই এসে ফাঁস করে দেয় যে ছবিটি তার নিজেরই আত্মপ্রতিকৃতি—এ-সবকিছুই শিশু-কিশোরদের নির্জল হাসিতে সরব করে রাখে।

বোঝার ব্যাপারটাই আসলে শিশুদের নয়। তাই শিশুসাহিত্যের বোঝার বিষয়টুকু, বলার কথাটুকু—বক্তব্যটুকু—কোনোদিন শিশুদের জন্য রচিত হয় না। শিশুসাহিত্যের এটুকু চিরকালই বড়দের। শিশুসাহিত্যের ভেতর গভীর যা কিছুই থাক সেই জিনিসগুলো কবিকে ধরতে হয় শিশুর ইন্দ্রিয়জগতের ভেতর দিয়ে, ঐ জগতের রস, গন্ধ, শব্দ, স্বাদের চমৎকারিত্বের ভেতর দিয়ে। ঐ পাওনাটুকু হাতেনাতে বুঝে পেলেই সে তার নালিশের খাতা থেকে কবিকে মুক্তি দিয়ে দেয়। আজকের সভ্যতার স্বার্থলোলুপ থাবার নিচে মানুষের সরল অবোধ আদিম হৃদয়টা যে কী নির্দয়ভাবে পদদলিত তার ব্যথিত পদাবলী এই বইয়ের 'বাঘের বাচ্চা' ছড়াটি পড়ার সময় শিশুরা হয়তো টের পাবে না ঠিকই, কিন্তু চিড়িয়াখানা পালানো গাট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ বাঘের বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে গুটুল মুটুল টুটুলের উদ্দাম শহর পরিভ্রমণের মুখর মুহূর্তগুলোকে সে প্রাণ ভরেই উপভোগ করবে। জগৎ ঐটুকুই। দরজা-ভাঙা খুশির জগৎ। ঐটুকু পেলেই সে খুশি। সেখানে সে প্রতিদিনকার ছক-কাটা, গৎ-বাঁধা, পাঠ্যবই শাসিত জীবন থেকে ছুটি পেয়ে একটা সত্যিকার জ্যান্ত বাঘের বাচ্চার সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো সারা শহর ঘুরে বেড়ায়, ঐ ভ্রমণের সব ঈর্ষিত গৌরব আর রোমাঞ্চ আস্বাদ করে। শিশুর জীবনকে সুপরিসরভাবে জানেন বলেই রিটন কবিতাটার মধ্যে শিশুর বিস্ময়ের পৃথিবীকে এমন অবলীলায় রচনা করতে পেরেছেন। আর একটা ছোট্ট কবিতা তুলে ধরছি :

নাম তার হরিদাস পাল ছিল
গায়ে তার ডোরাকাটা শাল ছিল
পান খেয়ে মুখ তার লাল ছিল
মা-বাবার আদুরে দুলাল ছিল।

তার মামাবাড়ি বরিশাল ছিল
মামিমার তরকারি ঝাল ছিল
সেই ঝাল খাওয়া তার কাল ছিল
বেঁচে নেই আজ, গতকাল ছিল।

এ কবিতার বিষয় পুরোপুরিই বড়দের। মৃত্যুর সঙ্গে শিশু-কিশোর কেবল যে অপরিচিত তাই নয়, এ বিষয়ে প্রায় অবিশ্বাসীই সে। কিন্তু কবিতার ভেতর শাল গায়ে দেওয়া হরিদাস পালের যে পান খাওয়া ঢিলেঢোলা অগোছালো চেহারাটি ভেসে ওঠে সে মানুষটি শিশুমনের কল্পনাকে উৎকর্ণ করে। ঐ খাপছাড়া আর উদ্ভটের ছোঁয়া-লাগা লোকটার

ভেতর সে তার স্বপ্নের মানুষটাকেই খুঁজে পায় কিছুটা। ঐ স্বল্পভাষী অদ্ভুত মানুষটার জন্যেই এটিতে শিশুজীবনের রস ঘন হয়ে জমেছে, কবিতাটির গাঢ় বক্তব্যটুকুর জন্যে নয়। এর শেষ পঙ্‌ক্তি কবিতাটিকে বড়দের কবিতা করেছে, বাকিটুকু শিশুকবিতা।

রিটনের কবিতার সবখানে এমনি বিস্ময় আর হাসির প্রাচুর্য। সেখানে বিস্ময় আর হাসি পরস্পরের উল্টোপিঠ। যে উদ্ভট আর অসঙ্গতিকে দেখে শিশুরা একখানে হাসিতে ভেঙে পড়ছে একটু পরে তাকেই সামান্য অন্যভাবে দেখে তারা একই পরিমাণে অবাক হচ্ছে। শিশুর রসনাকে তৃপ্ত করবার মতো এমনি নানান মুখরোচক মসলাই রয়েছে এখানে, কিন্তু কেবল রসনাকে তৃপ্ত করারই নয়, কানকে প্রীত করার মতো ধ্বনিসৌকর্যের যোগানও রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর ছন্দের জগৎ বৈচিত্র্যময়। এই ছন্দ নিখুঁত, সূক্ষ্ম, স্বতঃস্ফূর্ত ও ক্ষিপ্র। ছন্দের উচ্ছল ধারাই অনেক সময় কবিতা ফলিয়ে তোলে। মিলের সপারগতা, ক্ষিপ্রতা, দ্যুতি অবাক করে। ছন্দ ও মিলের সপ্রতিভ শক্তিতে তাঁর সাফল্য বাংলা শিশুসাহিত্যের বেশ কিছু উজ্জ্বল সাফল্যের পাশে জায়গা পাবার মতো।

রিটনের কবিতা পড়তে গিয়ে যে জিনিসটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা হল তার মৌলিকতা। তাঁর এই মৌলিকতাকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে কোনো অনুভূতিশীল স্মৃতি-প্রভাবিত মানুষের মতো বা সৎ কবির মতো তাঁর এই মৌলিকতাও নিখাদ নয়। একটু খতিয়ে তাকালেই দেখা যাবে বাংলাসাহিত্যের বেশ কিছু লেখকের প্রভাব তাঁর ওপর ছায়া ফেলে আছে। তাঁর অনেক সফল কবিতাও এর বাইরে নয়। এই বইয়ের কবিতার ছন্দশরীরে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষান্তি পিসির দিদিশ্বাশুড়ির' কবিতার ছাপ সুস্পষ্ট অবয়বে আঁকা, যেমন 'ম্যাকগাইভারের কাণ্ড' কবিতার গায়ে নজরুলের 'লিচু চুরি'র। তাঁর 'খিদে'কে সুকুমার রায়ের 'খাই খাই' আর রফিক আজাদের 'ভাত দে হারামজাদা'র ককটেলই হয়তো বলা যাবে, যেমন 'তোমার আমার', 'ঈদের দিনে' এ-সব কবিতায় জসীমউদ্‌দীনের 'আসমানী-খোসমানি'র। 'পাত্র সমাচার'-এর সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র'-এর এবং বেশ কিছু কবিতায় সুকান্তের স্পষ্ট উপস্থিতি চোখে পড়বে। তবু এইসব বিভিন্নমুখী প্রভাবের ভেতর থেকেও তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিমতা, শৈল্পিক দীপ্ততা ও কল্পনাশক্তির অনন্যতা এই কবিতাগুলোর শরীরে এমন একটা স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাকে দীপ্ত করেছে যা এগুলোকে ভিন্ন মাত্রায় মৌলিক করে তুলেছে। যে কবিতাগুলোয় তিনি মৌলিক সেগুলো সত্যি সত্যি অনবদ্য জিনিস। তাঁর 'বালকের দিনরাত্রি', 'বাঘের বাচ্চা', 'হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা', 'হোটেলের বয়', 'নাই মামা কানা মামা' কিংবা আরো কিছু চটুল কবিতা যেমন 'ডাক্তার', 'কুস্তি', 'গোবর্ধনের সংবর্ধনায়', 'ভোলারাম', 'ভোম্বল সংবাদ', 'বাবারে বাবা', 'নিধিরাম মিত্র' ইত্যাদি আগামীকালের বাংলা শিশুসাহিত্যের পাঠকের কাছে আদর পাবে।

বুদ্ধির দীপ্তিতে, সজীব রসিকতায়, স্বতঃস্ফূর্ততায়, বিস্ময়ের শক্তিতে তাঁর শিশু-কিশোর কবিতা আমাদের সময়ের অন্যতম সেরা উপহার। আমার অনুভূতি এ-রকম যে সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের শিশুকবিতার ধারার তিনি সবচেয়ে সফল কবি এবং বাংলাভাষার শিশুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিদের একজন।

**আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ**
২৩ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা ১০০০

উৎসর্গ

ছড়াশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রথম পর্ব ■ ছড়া

## সূ চি পা তা

খিদে ১৫ / হোটেলের বয় ১৭ / কুস্তি ১৮
হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা ১৮ / ডাক্তার ১৯ / নিখোঁজ ১৯
গোবর্ধনের সংবর্ধনায় ২০ / হরিদাস পাল ২১ / বাঘের বাচ্চা ২১
বাবা রে বাবা ২৬ / ভোলারাম ২৭ / নাই মামা কানা মামা ২৭
ম্যাকগাইভারের কাণ্ড ২৯ / ভোম্বল সংবাদ ৩০ / উল্টো পাল্টা ৩১
ভাল্লাগে না ৩২ / ম্যাট্রিকে হ্যাট্রিক ৩৩ / বালকের দিনরাত্রি ৩৩
মেঘে মেঘে রবীন্দ্রনাথ ৩৬ / দাদুর গরম ৩৬ / মামা ভাগ্নে ৩৭
এক যে কোলা, এক যে কুনো ৩৭ / নিধিরাম মিত্র ৩৯ / পাত্র সমাচার ৪০
সে ৪১ / অভাগা ৪২ / লুকুচুলি ৪৩ / দাওয়াই ৪৩ / পিতা-পুত্র সংবাদ ৪৪
টাক দিয়ে যায় চেনা ৪৪ / একদিন ঘুড়ি হয়ে ৪৬ / গুডবাই ৪৭

# খিদে

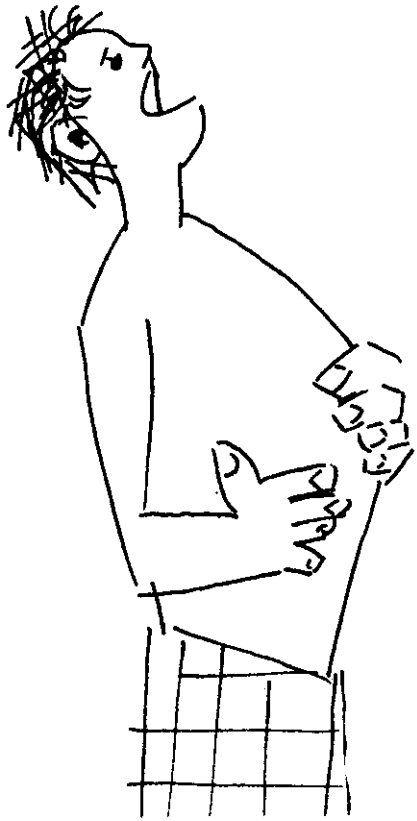

আবদুল হাই
করে খাই খাই
এক্ষুনি খেয়ে বলে
কিছু খাই নাই।

লাউ খায় শিম খায়
মুরগির ডিম খায়
কাঁচা পাকা কুল খায়
খেয়ে মাথা চুলকায়
ধুলো খায়
মুলো খায়
মুড়ি সবগুলো খায়
লতা খায় পাতা খায়
বাছে না সে, যা-তা খায়
থেকে থেকে খাবি খায়
কত হাবিজাবি খায়
সেদ্ধ ও ভাজি খায়
খেয়ে ডিগবাজি খায়
কলমের কালি খায়
বকুনি ও গালি খায়
থামে না সে, খালি খায়!

গরু খায় খাসি খায়
টাটকা ও বাসি খায়
আম খায়
জাম খায়
টিভি প্রোগ্রাম খায়।

খোলা মাঠে হাওয়া খায়
পুলিশের ধাওয়া খায়
ফুটবল কিক খায়
রক মিউজিক খায়
মিষ্টির হাঁড়ি খায়
জামদানি শাড়ি খায়
ভাত তরকারি খায়
টাকা কাঁড়ি কাঁড়ি খায়!

চকোলেট টফি খায়
শরবত কফি খায়
ঘটি খায় বাটি খায়
চিমটি ও চাঁটি খায়
হাসি খায় খুশি খায়
ভুসি খায়
ঘুসি খায়।

ট্যাংরা ও তিমি খায়
সফ্‌টড্রিংকস মিমি খায়
বেঞ্চি ও টুল খায়
বিরিয়ানি ফুল খায়
স্বর্ণের দুল খায়
খেয়ে ক্যাপসুল খায়।
গাড়ি খায়
বাড়ি খায়
পুলিশের ফাঁড়ি খায়।
গুঁতো খায়
জুতো খায়
সুই আর সুতো খায়।
তরতাজা হাতি খায়
শরীফের ছাতি খায়
মাঝে মাঝে লাথি খায়!

যা দেখে সে তাই খায়
আশট্রে ও ছাই খায়

খেতে খেতে খেতে খেতে
পেট হলো ঢোল,
তবু তার মুখে সেই
পুরাতন বোল—
কী যে অসুবিধে
খালি পায় খিদে!

আবদুল হাই
করে খাই খাই
এক্ষুনি খেয়ে বলে
কিছু খাই নাই!

## হোটেলের বয়

হোটেলে ঢুকেই চ্যাঁচালেন তিনি
আন দেখি ব্যাটা বিরিয়ানি!
হোটেলের বয় সবিনয়ে কয়—
দ্যান, ট্যাহা দ্যান, বিড়ি আনি।

রেগে কন তিনি, আন দারুচিনি
সাথে ওয়াটার ঠাণ্ডা।
মাথা চুলকিয়ে বলে বয়, ইয়ে...
কই পামু সাব আণ্ডা?

মেজাজটা তার সপ্তমে ওঠে
রেগে কন, ব্যাটা বেয়াকুব?
তবু সেই বয় বিচলিত নয়
বলে স্যার, আমি এয়াকুব!

## কুস্তি

হাবু আর গাবু দুইজনে খুব দুস্তি;
দিন নেই রাত নেই করে শুধু কুস্তি।

হাবু বেশ বড়সড়, গাবুটা তো পিচ্চি
হেরে গিয়ে হাবু বলে—উৎসাহ দিচ্ছি।

## হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা

হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা
পিটিয়ে ছাগল 'ম্যান' করেংগা
তালের পাখায় ফ্যান করেংগা
খামোখাই প্যান প্যান করেংগা।

দেশকে স্বপ্নপুরী করেংগা
অপরের খেয়ে ভুঁড়ি করেংগা
ডানে বাঁয়ে ঘোরাঘুরি করেংগা
দিনে দুপুরেই চুরি করেংগা।

ঘোড়া মারেংগা হাতি মারেংগা
হকিইস্টিক ছাতি মারেংগা
শত্রু এবং সাথী মারেংগা
পেলেই সুযোগ লাথি মারেংগা।

প্রয়োজনে প্রাণ দান করেংগা
দেশের সেবায় গান করেংগা
দু'চোখের জলে স্নান করেংগা
গুছিয়ে আখের রান করেংগা।

হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা
স্বার্থবিহীন ক্যান করেংগা?

## ডাক্তার

আজগুবি ডাক্তার
হাঁদারাম ঘোষ
চুলকানি হলে কয়—
মোমবাতি চোষ!

## নিখোঁজ

সোমবারে জন্মাল হাবু
মঙ্গলে ফিটফাট বাবু।
বুধবারে চিটাগাং গিয়ে—
দেখেশুনে করল সে বিয়ে।
বিষ্যুদে হলো তার ছেলে
দিন কাটে তাই হেসে খেলে।
শুক্কুরে পেকে গেল দাড়ি
বয়সের কী যে বাড়াবাড়ি!
শনিবারে বুড়ো লাঠি হাতে
শুয়ে পড়ে সোজা বিছানাতে।

রোববারে ঘটনাটা এই—
হাবু কই? কোথাও নেই।
(বিদেশি ছড়ার ছায়া অবলম্বনে)

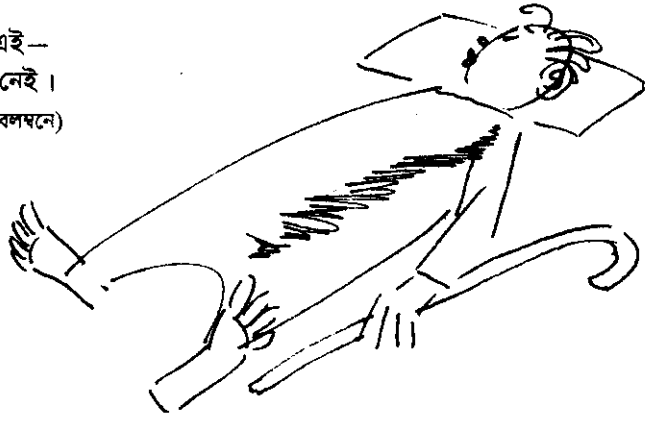

# গোবর্ধনের সংবর্ধনায়

আগে নাকি গোবর ছিল
গোবর্ধনের মাথায়
পরীক্ষাতে মারত সে ফেল
লাড্ডু পেত খাতায়।

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষাতে
ফেল মারা তার খতম
সবাইকে সে টেক্কা দিয়ে
মেরিট লিস্টে 'প্রথম'!

শিক্ষকেরা বেজায় খুশি
সবাই তালি বাজায়
উৎসাহ আর উদ্দীপনায়
মঞ্চ-তোরণ সাজায়।

'গোবর্ধনের সংবর্ধনা'
মঞ্চে লেখা ব্যানার
গোবর্ধনের ভাবটা যেন
দিগ্বিজয়ী সেনার।
হেডমাস্টার বক্তৃতাতে
প্রশংসা তার করেন
গোবর্ধনের অধ্যবসায়
ডিটেলস তুলে ধরেন।
হেডমাস্টার প্রশ্ন করেন
গোবর্ধনের কাছে—
বল বাবা, কিছু চাওয়ার
কিংবা জানার আছে?

খুব বিনয়ে গদগদ
শ্রী গোবর্ধন জানায়—
'প্রশ্নপত্র ছাপা হবে
কোন্ সে ছাপাখানায়?'

## হরিদাস পাল

নাম তার হরিদাস পাল ছিল
গায়ে তার ডোরাকাটা শাল ছিল
পান খেয়ে মুখ তার লাল ছিল
মা-বাবার আদুরে দুলাল ছিল।

তার মামাবাড়ি বরিশাল ছিল
মামিমার তরকারি ঝাল ছিল
সেই ঝাল খাওয়া তার কাল ছিল
বেঁচে নেই আজ, গতকাল ছিল।

## বাঘের বাচ্চা

গুটুল মুটুল এবং টুটুল
বন্ধু ছিল তিন
সবাই মিলে কী ঘটনা
ঘটাল সেইদিন!

ছুটির দিনে সকালবেলা
বন্ধুরা করছিল খেলা
জানালা ছিল পর্দা টানা
হঠাৎ একটা বেড়ালছানা
সেই জানালায় দিল উঁকি
বলল, 'কী গো খোকাখুকি?
গুডমর্নিং হালুম হালুম
চিড়িয়াখানা থেকে আলুম।'

শুনেই ওরা অবাক, আরে!
মিয়াঁও হালুম বলতে পারে?
বলল তখন বেড়ালছানা—
'শোনো তবে কাণ্ডখানা

ভেঙে লোহার বিরাট খাঁচ্চা
পালিয়ে আলুম বাঘের বাচ্চা।
মিয়াঁও তো নই, হালুম হালুম
এবার কি ভাই হচ্ছে মালুম?'

গুটুল মুটুল টুটুলরা সব
করল শুরু কী কলরব!
'তুমি আমাদের বন্ধু হবে?
ড্রয়িং রুমে এস তবে।'
বাঘের বাচ্চা বলল, 'আসি
এই তোমাদের ভালোবাসি।

মিরপুরের ওই চিড়িয়াখানায়
আমাকে ছাই একটু মানায়?
বন্দি জীবন ভাল্লাগে না
মুক্ত হতে চাইবে কে না!
তাই তো এলাম দেখতে শহর
কেবল মানুষ গাড়ির বহর।'

বাঘছানাকে সঙ্গী করে
ছোট একটা ভ্যানে চড়ে
গুটুল মুটুল টুটল মিলে
ঘুরল শহর, মতিঝিলে।
শহরবাসী অবাক—'আচ্ছা!
এ যে দেখছি বাঘের বাচ্চা!
গায়ে ডোরা আঁকিবুকি
শাবাশ খোকা, শাবাশ খুকি।'

মতিঝিলের শাপলা দেখে
বাঘের বাচ্চা উঠল ডেকে—
'হালুম হালুম হালুম হালুম
শাপলা খালুম শাপলা খালুম।'

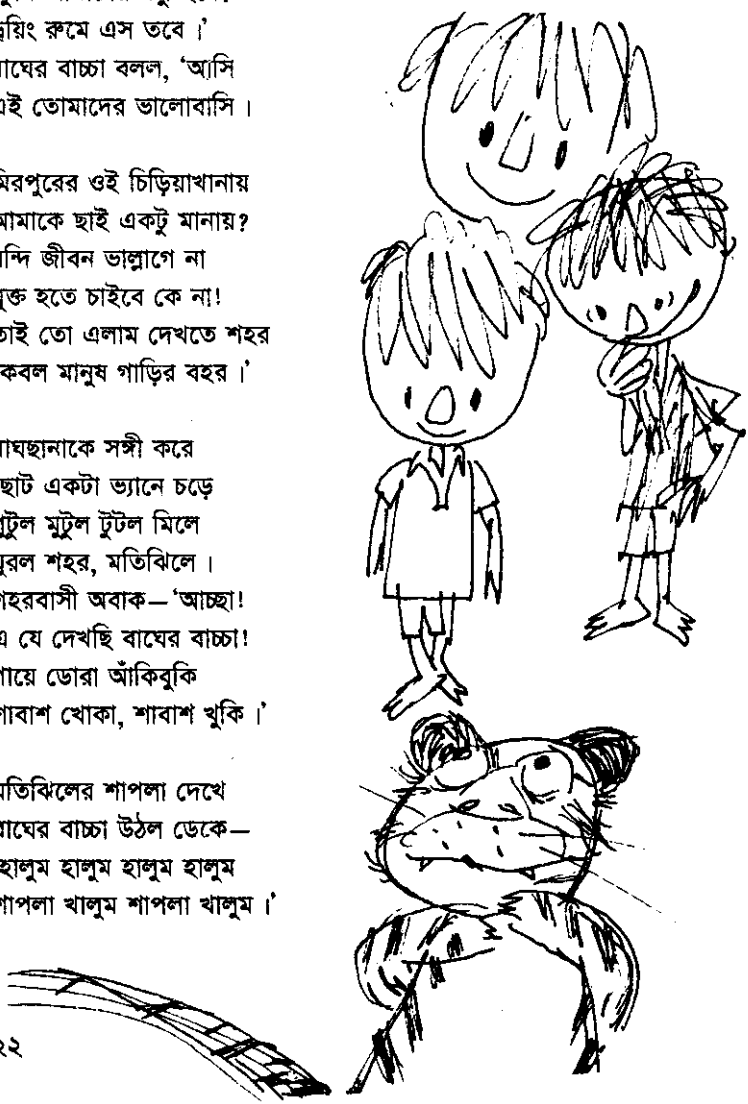

থমকে দাঁড়ায় পথচারী
জ্যাম লেগে যায় রিকশা গাড়ি।
খুব রেগে যায় ট্রাফিক পুলিশ—
'ভ্যানের ওপর ব্যাঘ্র তুলিস?'
বলেই ভ্যানের চালকটাকে
ট্রাফিকটা ধমকাতে থাকে।
ভ্যানের চালক বলল—'স্যার
ধমক দেবার কী দরকার?
ট্রাফিক আইনে বাঘের ছানা
বহন করতে নেইকো মানা।'
বাঘের বাচ্চা বলল, 'হালুম
আচরণে দুঃখ পালুম।'

শিশুপার্কে এল ওরা
চড়ল বিমান—কাঠের ঘোড়া
সানফ্লাওয়ারে-ফুলদানিতে
দারুণ মজা নিতে নিতে
স্কেটিং করে চড়ল রেলে
কাটল সময় হেসে খেলে।
দারুণ বটে কাণ্ডখানা
শিশুপার্কে বাঘের ছানা!
পার্কে যত ছেলে বুড়ো
করল শুরু তাড়াহুড়ো।
আন্টি, আঙ্কল কিংবা চাচ্চা
সবাই অবাক—বাঘের বাচ্চা!

পিচ্চিগুলো মজা পেয়ে
কোরাস সুরে উঠল গেয়ে—
'ওয়েলকাম টু আওয়ার সিটি'
বাঘের বাচ্চা দেখতে প্রিটি।

বাঘের বাচ্চা বলল, 'হালুম
শিশুপার্কে মজা পালুম।'

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAE

গড়িয়ে বিকেল সন্ধ্যা নামে
এল ওরা স্টেডিয়ামে।
স্টেডিয়ামে বাঘের ছানা
ডিগবাজি খায় তাধিন তানা।
সদরঘাটে ওরা গেল
চটপটি আর ফুচকা খেল।
লঞ্চে উঠে বাঘের ছানা
মুগ্ধ হয়ে গাইল গানা—
'হালুম হালুম হালুম হালুম
নদীর হিমেল বাতাস খালুম।'

রাতের বেলা ডিনার খেতে
'হোয়াং হো'-তে যেতে যেতে
বাঘের বাচ্চা বলল—'সেথায়
হরিণছানার স্যুপ পাওয়া যায়?'

থাই কর্ন স্যুপ ভেজিটেবল
ফ্রায়েড চিকেন পর্ন ফিসবল
খেয়ে দেয়ে বাঘের ছানা
বলল, 'এ যে দারুণ খানা!
যদি এমন রোজ খাওয়া যায়
ফিরব না আর চিড়িয়াখানায়
হালুম হালুম হালুম হালুম
চায়নিজে খুব মজা পালুম।'

চড়ে একটা টেম্পু গাড়ি
রাতে ওরা ফিরল বাড়ি।

টিভি স্ক্রিনে খবর পাঠক—
বলল, 'পেলেই করুন আটক
ভেঙে লোহার বিরাট খাঁচ্চা
পালিয়ে গেছে বাঘের বাচ্চা।
শহরবাসী সজাগ থাকুন
দোর জানালা বন্ধ রাখুন।

ছোট্ট পাজি বাঘের ছানা।
হঠাৎ করেই দেবে হানা।
ডায়েরি আছে থানায় থানায়
কেউ যদি তার খবর জানায়
চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ
টাকা দেবে আড়াই লক্ষ।'

এমন খবর শোনার পরে
বাঘের ছানা হেসেই মরে—
'এত্ত ভয়ের কারণটা কী?
আমি ভয়াল ব্যাঘ্র নাকি?
হালুম হালুম হালুম হালুম
বন্ধু হবার জন্যে আলুম!
তোমরা মানুষ বড্ড পাজি
আটকে রাখতে কেবল রাজি।
বন্ধু হতে চাইব না আর
এক সাথে গান গাইব না আর
পালিয়ে যাব শহর ছেড়ে।'

বলেই খুদে লেজটা নেড়ে
অভিমানী বাঘের ছানা
কোথায় গেল, নেইকো জানা।

গুটুল মুটুল এবং টুটুল
বন্ধু ওরা তিন—
বাঘ বন্ধুর জন্যে কাঁদে
সমস্ত রাতদিন।

# বাবা রে বাবা

আমার মতোই বাবাটাও নাকি ছোট্ট ছিল রে আগে?
ভাবতে কী ভালো লাগে!
নীল হাফপ্যান্ট আর সাদা শার্ট পরে যেত ইশকুলে
কান ছিল তুলতুলে
সেই কান দুটো প্রিয় ছিল খুবই ক্লাসটিচারের কাছে!
সেটা তো জানাই আছে
ইশকুলে গিয়ে কপালে জুটত নিয়মিত কানমলা
চোখ বুজে যায় বলা।

বাবাটার বাবা রাগী ছিল খুবই যেমনটি এই বাবা
'গোল্লায় তুমি যাবা'—
একথা বলেই পিটুনি লাগাত কষে দিত চড় কিল
আরো ছিল মুশকিল
আমার মতোই খেলতে দিত না বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
বুড়ো পাজি ছিল কী যে!

আজ বড় হয়ে বাবাটা দ্যাখ্ ঠিক দাদুটারই মতো
শাসন করে যে কতো!
আমি বড় হলে আমার ছেলেকে একটুও বকব না
বলব, 'লক্ষ্মী সোনা—
ইশকুলে যেতে হবে না তোমাকে, বৃষ্টিতে খেলো গিয়ে'

বলব কী ভাই, বিপদেই আছি পাজি বাবাটাকে নিয়ে।

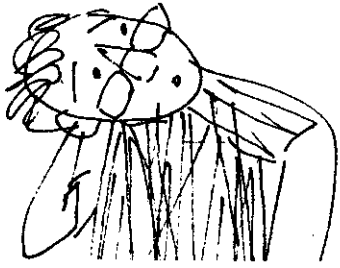

## ভোলারাম

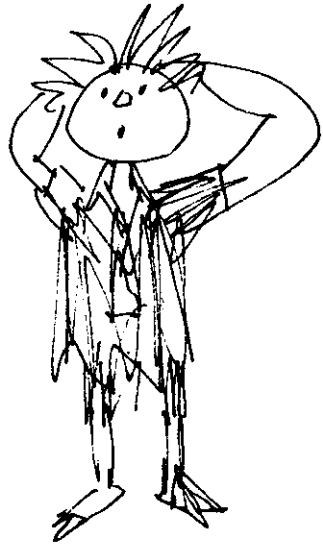

ভোলারাম নাম তার, সংক্ষেপে ভোলা
উস্‌কো খুস্‌কো চুল চোখ ফোলা ফোলা।
মনে হয় চিন্তায় রয়েছে সে ডুবে
ঘুম থেকে উঠল সে, কিংবা ঘুমুবে।
অথবা পকেট থেকে টাকা গেছে খোয়া
এক্ষুনি কাঁদবে সে করে ওঁয়া ওঁয়া।

কী ব্যাপার বোঝা ভার তার হলোটা কী?
অঙ্কে সে লাড্ডুই পেয়ে গেল নাকি?
স্ট্যান্ড আপ হয়েছিল আজ ইশ্‌কুলে?
কোন সে কারণ এই ঘটনার মূলে?

শেষমেশ ভোলারাম মুখ খোলে নিজে
ভোলারাম ভুলে গেছে নাম তার কী যে!

## নাই মামা কানা মামা

নাই মামা কানা মামা দুই মামা মিলে
ঝগড়া কী করলেন কাল মতিঝিলে!

নাই মামা বললেন, তুই হলি কানা
তোকে তাই ব্যাকরণে মামা বলা মানা।
কানা যদি মামা হয় ল্যাংড়াও তবে
এ-জগতে একদিন প্রিয় মামা হবে।
মামা হতে হলে তার চোখ থাকা লাগে
তা না হলে মানুষের সন্দেহ জাগে।
চোখহীন মামা সে তো দাঁতহীন বাঘ
সুতরাং এক্ষুনি ব্যাটা তুই ভাগ!

কানা মামা বললেন, বলব কী ভাই
সবচে সে হতভাগা থেকেও যে নাই।
নাই মামা মামা হলে যারা নাকি আছে
তাদের কী গতি হবে? মামা ধরে গাছে?
পাগল-ছাগল সব মামা হলে পরে
অশান্তি লেগে যাবে প্রতি ঘরে ঘরে।
মামা আর ভাগ্নের সম্পর্কটা
জানি আর ছড়াবে না আলোকের ছটা।
তাই নাই মামা হয়ে নেই কোনো ফল
তার চেয়ে 'জয়গুরু কানা মামা' বল।

নাই মামা রেগে গিয়ে বললেন, গাধা
'কানা' মামা হতে পারে পুরো নয়, আধা।
আধা মানে হাফ মামা, তার চেয়ে আয়—
ভাগ্নের দলে তোকে টেনে নেয়া যায়।

কানা মামা বললেন, নাই মামা ওরে—
মামা যদি হওয়া যেত শরীরের জোরে
তাহলে তো জগতের পালোয়ান গামা
নিমিষেই হয়ে যেত সকলের মামা।
এরকম কোনোদিন শুনেছিস নাকি?
তার চেয়ে আমি তোর মামা হয়ে থাকি।
চলে আয় তুই আমার ভাগ্নের দলে
'নাই' হলে ভাগ্নের দলে নেয়া চলে।

নাই মামা খানিকটা দম নিয়ে শেষে
বললেন ক্ষীণ স্বরে মৃদু মৃদু হেসে—
মামা হওয়া সোজা নয়, উজবুক কানা
মামা হতে হলে লাগে লেখাপড়া জানা।

কানা মামা রেগে যান তার কথা শুনে—
বি.এ. পাস করলাম নাইনটির জুনে!
তুই নাই তাই তোর বিদ্যেও নাই
মূর্খরা মামা হলে নিন্দা জানাই।

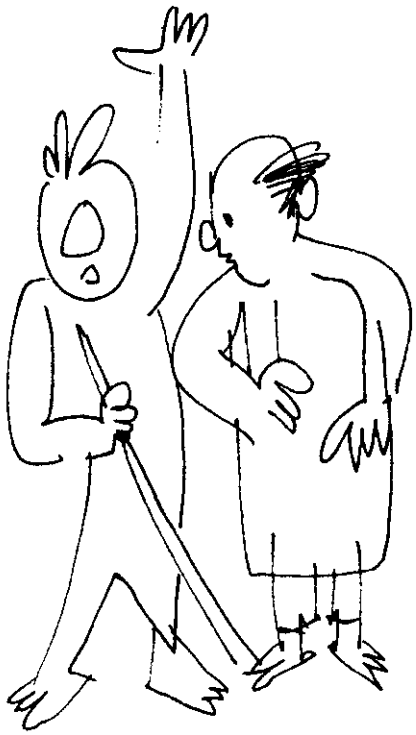

অতঃপর নাই মামা করেন না লেট
চট করে বের করে সার্টিফিকেট—
বললেন, তুই বিএ? আমি বিএ-বিটি
খতম কলেজ আর ইউনিভার্সিটি।

নাই মামা কানা মামা বিএ, বিএ-বিটি
দুজনার বসবাস ম্যাক্সিকো সিটি।

## ম্যাকগাইভারের কাণ্ড

আহা কী মজার ব্যাপার
টিভির ঐ ম্যাকগাইভার
গতকাল পর্দা ফুঁড়ে—
দিল কী কাণ্ড জুড়ে!

আমি তো অবাক ভীষণ
ভেঙে গেল টেলিভিশন!
ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি?
ভয়ে তো সিঁটিয়ে থাকি!

সহসা মিষ্টি হেসে
সে আমার কাছে এসে
হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে
আমাকে সঙ্গে নিয়ে
চলে গেল ছাদের ওপর
একটা রঙিন টোপর
আমাকে দিল উপহার
টিভির ঐ ম্যাকগাইভার!

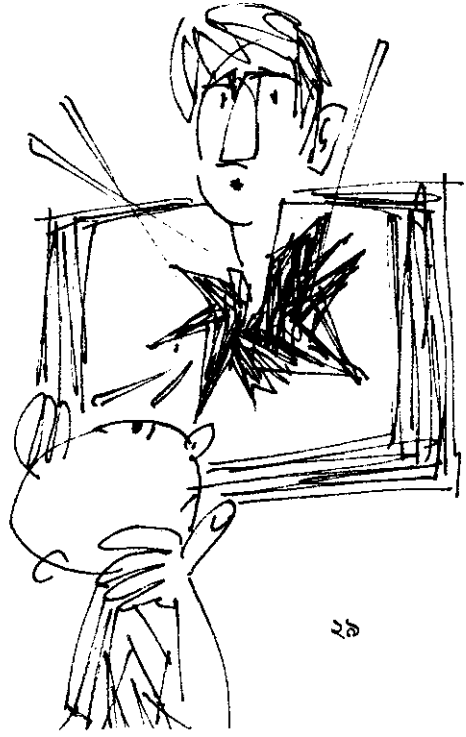

কী বলিস?
খেয়ে-দেয়ে
তবে তুই
আমাদের
ওটা ভাই
ভেঙেছে

আমি গুলবাজ?
নেই বুঝি কাজ?
দেখে যাস কাল
টিভিটার হাল।
ভেঙে চুরমার,
ম্যাকগাইভার!

## ভোম্বল সংবাদ

মিছে নয়—হাঁচা,
ভোম্বল বাংলায় ছিল খুব কাঁচা।
রেগে গিয়ে শিক্ষক শ্রী মকিম চান
বললেন, 'দ্যাখ গাধা সঠিক বানান—
বানানটা দশবার তুই লিখে আন।'

ভোম্বল বানানটা একবার লিখে
এগিয়ে ধরল শ্রী মকিমের দিকে,
শিক্ষক রেগেমেগে
বললেন ঝড়ের বেগে—
'বললাম দশবার, কী শুনেছিস?
তুই কিনা একবার লিখে এনেছিস!'

ভোম্বল বলে, 'আমি অঙ্কেও কাঁচা।'
মিছে নয়—হাঁচা।

# উল্টো পাল্টা

লম্বাটে গড়নের বেটেখাটো মেয়ে
ড্যাবড্যাবে কানা চোখে থাকে শুধু চেয়ে।
কালোকেশী এলোকেশী যদিও সে টেকো
কেশবতী কন্যে সে, এটা মনে রেখো।

ফর্সা গায়ের রং দেখতে সে কালো
খিটখিটে মেজাজের মেয়ে খুব ভালো।
ফ্যাসফ্যাসে গলা তার যেন মধু ঢালা
যখন সে গান করে কানে লাগে তালা।

শান্ত সুবোধ মেয়ে মহা ঝগড়াটে
বলে সে যে তেরো হয় সাতে আর আটে।
অঙ্কে সে পটু তবে ইতিহাসে পাকা
যদিও হয় না তার সাল মনে রাখা।

ইংরেজি ভালো জানে, ক্যাট মানে ঘেউ
তার সাথে কথা বলে পারবে না কেউ।
বিজ্ঞানে মহাজ্ঞানী বলে জোরেশোরে
পৃথিবীটা ঘোরে নাতো, সূয্যিটা ঘোরে।

হেঁসেল সামাল দেয় পাকা রাঁধুনি সে
গুবলেট লবণের সাথে চিনি মিশে।
পৃথিবীটা ঘুরে এস এরকম গুণী—
মেয়ে আর একটাও খুঁজে পাবে শুনি?

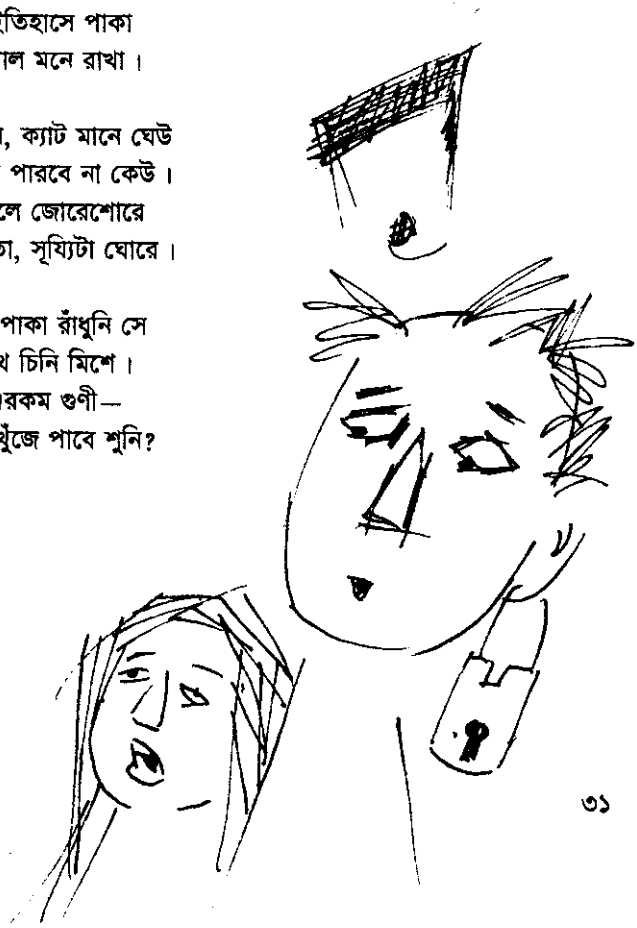

# ভাল্লাগে না

সে কেবলই ভোগে
'ভাল্লাগে না' রোগে।
ভাল্লাগে না খেতে
ইশকুলে আর যেতে
জন্মদিনে বই চকোলেট
প্রেজেন্টেশন পেতে।
ভাল্লাগে না গান
ম্যাডোনা জ্যাকসান
ম্যাকগাইভারসহ টোটাল
টিভি অনুষ্ঠান।

ভাল্লাগে না ঘুম
মায়ের আদর, চুম
ভিসিআর-এ অমিতাভের
ঢিশ্যুম ঢুশ্যুম।

ভাল্লাগে না পড়া
গঙ্গা ফড়িং ধরা
শিশুপার্কে বিকেলবেলায়
কাঠের ঘোড়ায় চড়া।
ভাল্লাগে না বসা
কী যে করুণ দশা
যতই সাধো খাবে না সে
ঝাল লবণে শশা।

ভাল্লাগে না শোয়া
মুড়কি মুড়ি মোয়া
ওর কেবলই ভালো লাগে
কাঁদতে ওঁয়া-ওঁয়া।

কারণ বলে দিচ্ছি—
এই ছেলেটা এত্তটুকুন
দুধের শিশু পিচ্চি!

## ম্যাট্রিকে হ্যাট্রিক

কথা বলে খুব চটাং চটাং
ওয়ারীর ছেলে রঘু রায়।
পৈতৃক বাড়ি নোয়াখালী, আর
নানা থাকে সেই বগুড়ায়।

ম্যাট্রিক পাস করে নি যদিও
এই ভয়ে সে তো ভীত নয়।
এইবার নিয়ে দুইবার হলো
রঘু তা-ও বিচলিত নয়।

সালাউদ্দিন হ্যাট্রিক করে
এটা খুব ভালো লাগে ওর।
ম্যাট্রিকে তাই হ্যাট্রিক করি,
হৃদয়ে ইচ্ছে জাগে ওর।

## বালকের দিনরাত্রি

এক ছোট্ট ছেলে
রোজ বিকেলবেলা
বই- পত্র ফেলে
চায় করতে খেলা।

ওর সকাল দুপুর
বড় কষ্টে কাটে
পাঠ- শালাতে গিয়ে
মন বসে না পাঠে।
মা'র বকুনি এবং
রাগী বাবার শাসন
সেই সঙ্গে থাকে
বড় আপুর ভাষণ—

'এই জীবনে যদি
তুই বড় হতে চাস
তবে মন দিয়ে পড়
কর ঠিকমতো ক্লাস।'

সেই ছোট্ট ছেলের
মন করে আনচান
বাবা মায়ের ওপর
ওর কী যে অভিমান!

আপু খুব সুন্দরী
তবে ভীষণ পাজি
ওকে কষ্ট দিতেই
থাকে কেবল রাজি।

কেউ মন বোঝে না যে
ওর মন বোঝে না যে,
শুধু বলে—পড় পড়
রাতে সকাল সাঁঝে।

শুধু পড়া পড়া পড়া
বলো কারো ভাল্লাগে?
সেই ছেলেটা একা
ঘুড়ি ছিঁড়ে ফেলে রাগে।
ভেঙে ফেলে সে লাটাই
ছিঁড়ে ফেলে সে সুতো
আর জানলা দিয়ে
ছুড়ে ফেলে সে জুতো।

আহা কী যে অভিমান
ওর চোখ ছলোছল
ওরা এমন কেন?
চোখে জল টলোমল!

ওই ইংরিজি বই
আর অঙ্ক খাতা
আর ভূগোলের ম্যাপ
দেখে ঘুরে যায় মাথা।

পড়া রেডি করতেই
ওর বিকেল গড়ায়
হোম- টাস্ক করতেই
ওর রাত চ'লে যায়!

ছেলে খেলবে কখন?
বলো খেলবে কখন?
ফুল- পাখির সাথে
কবে হবে আলাপন?
ওর সময় কোথায়?
বলো সময় কোথায়?
পড়া রেডি করতেই
ওর দিন চলে যায়!

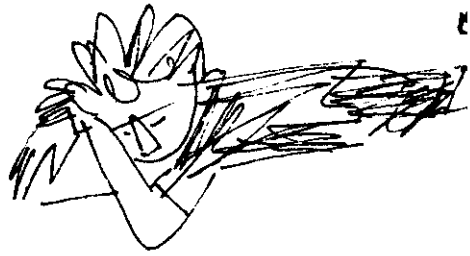

ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ
চোখে স্বপ্ন ভাসে—
দেখে নানা বর্ণের
প্রজা- পতিরা আসে।
ঘাস- ফড়িঙের দল
আর জোনাকপোকা
বলে— টাটা বাইবাই
তুমি বড্ড বোকা!
ও তো বন্দি পাখি
শুধু ডানা ঝাপটায়
ওর মন উড়ে যায়
ওই দূর নীলিমায়।

সেই ছোট্ট ছেলেটা
যেন দম দেয়া ঘড়ি,
চলে টিক টিক টিক
বলে, পড়া রেডি করি।

## মেঘে মেঘে রবীন্দ্রনাথ

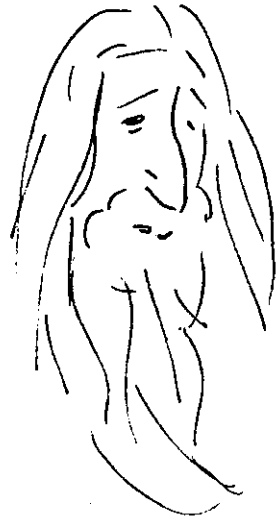

টুকরো টুকরো মেঘের ভেলা
নীল আকাশে করছে খেলা।
মেঘের ভেলা যাচ্ছে ভেসে
দোল দিয়ে যায় বাতাস এসে।
মেঘের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে
হঠাৎ অন্য রূপ সে ধরে—
বিশাল পাহাড় পড়ল নুয়ে,
রবীন্দ্রনাথ আছেন শুয়ে!

আবার এল তুমুল হাওয়া
মেঘগুলোকে করল ধাওয়া।
মেঘের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে
আবার অন্য রূপ সে ধরে—
কী ভয়ানক দৈত্য নাচেন,
রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন!

ছুটল বাতাস উল্টোদিকে
শুভ্র আকাশ হঠাৎ ফিকে।
মেঘের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে
আবার নতুন রূপ সে ধরে—
অবাক কাণ্ড! বাড়িয়ে দু'হাত
বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ!

## দাদুর গরম

দাদুর মেজাজ ভীষণ খারাপ
এবার বেশি গরম পড়ায়
পায়ের তালু খটখটে তার
সেই গরমে খড়ম পরায়।

গরমকালে দাদুর মেজাজ
দেখছি—বংশ পরম্পরায়!

# মামা ভাগ্নে

বন থেকে এক বাঘ এল এই শহরে
রুপোলি ধলপহরে।
ল্যাজ নাড়িয়ে হাঁক দিল সে, হুম!
সামনে দিয়ে কৌন যাতা হ্যায় তুম?
টপকে সাহেব বাড়ির বিরাট দেয়াল
যাচ্ছিল এক শেয়াল।
বাঘ দেখে ওর ভিরমি খাওয়ার পালা
চক্ষে দেখে সর্ষে ফুলের মালা।
করল শুরু আমতা এবং আমতা
ভুলেই গেল সহজ একের নামতা।

বাঘটা আবার গর্জে ওঠে, হুঁম...।
শেয়াল বলে, সালামালেকুম।

বাঘ শুধাল, কোথায় বাড়ি? জলদি বাতাও, হালুম,
চেহারাটা চেনা চেনা, মাগার নেহি মালুম।

বলল শেয়াল, সারে গারে গামা
কেমন আছেন মা'র ছোট ভাই মামা?

# এক যে কোলা
# এক যে কুনো

এক ছিল কোলা ব্যাঙ
এক ছিল কুনো
এটা খায় ওটা খায়
হয়ে ঘরকুনো,
ফিল্টার সিগারেট
খায়, পান। চুনও।

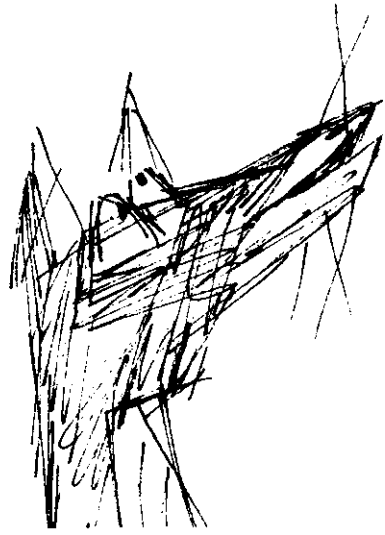

কুনো বলে, কোলা
পেটুকের মতো খাস
তাই পেট ফোলা।
পরনের জামাটাও
বিচ্ছিরি, ঢোলা।
হতে তুই পারবিনে
ইস্‌মার্ট পোলা।

কোলা বলে, কুনো
মার খেয়ে কোন্‌দিন
হবি তুলো-ধুনো।
বুদ্ধি হলো না তোর
পেকে হলি ঝুনো,
ব্যাঙ প্রজাতিতে তুই
সবচেয়ে বুনো।

দুই ব্যাঙে মারামারি
লেগে গেল, আর—
দুজনেই ঘেমে নেয়ে
হলো একাকার।

কুনো আর কোলা
পেট পুরে খেয়ে নিল
তিন কেজি ছোলা।
ঢক ঢক করে খেল
দু'লিটার কোলা,
মানে, কোকাকোলা।

# নিধিরাম মিত্র

নিধিরাম মিত্র—
রাতদিন খেটেখুটে
এঁকেছেন চিত্র।
নিধিরাম মিত্র।

ছবিটায় কী কী আছে
বোঝা বড় ঝামেলা,
ঘেমে নেয়ে একাকার
ছোট মেয়ে পামেলা।

কেউ বলে ধুত্তুরি
কিছু বোঝা যায় না,
অবশ্য হতে পারে
পেত্নি কি হায়না।

কেউ বলে গরু এটা
দ্যাখো শিং বাঁকানো,
আহ্‌হারে গোবেচারা
যাচ্ছে না তাকানো।

কেউ বলে, আরে না না
এটা রাম ছাগলের—
পোর্ট্রেট। নয়তো বা
হাইজাম্প পাগলের।

কেউ বলে এটা ঠিক
পালকি ও বেহারা,
নিধি বলে, এ আমার
নিজস্ব চেহারা!

# পাত্র সমাচার

কনের বাবার কাছে—
ঘটক এসে বলল, হুজুর
পাত্র রেডি আছে।
: দেখতে কেমন?
—কুঁতকুঁতে,
মনটা শুধু খুঁতখুঁতে।
: মেজাজ কেমন?
—খিটখিটে
চক্ষু দুটি পিটপিটে।
: চাল চলনে?
—শির উর্ধ্বে
ভদ্রতারই বিরুদ্ধে।
: পোশাক আশাক?
—মন্দ না,
হবে অপছন্দ না।
: টাক নেই তো?
—না, তবে কি—
মাথাই ন্যাড়া, টাক হবে কী!
: গায়ের গঠন?
—এ্যায়সা মোটা,
তাতেই ঘষে পানের বোটা।
: হাত পা'গুলো?
—হ্যাংলা কাঠি,
চিকন চিকন বাঁশের লাঠি।
: খাওয়াদাওয়ায়?
—পেটুক তো নয়
একটা খাসি, ওতেই হয়।
: খেলাধুলোয়?
—ভীষণ পাকা,
খাটের তলায় লুকিয়ে থাকা।
: সাহস কেমন?
—খুব বলা যায়,

ছাগল দেখেই দৌড়ে পালায়।
: ছুটতে পারে?
—দারুণ ছোটা,
খানিক বাদেই হাঁপিয়ে ওঠা।
: সাঁতার জানে?
—একটুখানি,
ডুবে ডুবে খায় সে পানি।
পাত্র এমন পাওয়া সোজা?
বলেই ঘটক চক্ষু বোজা।

কনের বাবা বলল, ব্যাটা
পাত্র এটা? আপদ, ল্যাঠা,
এমন ছেলের মুখে ঝাঁটা,
ঘটক পালায় দৌড়ে, টা টা...

## সে

তেলাপোকা হাতে মারে
টিকটিকি ফিনিসে।
অহেতুক রং করে
আনকোরা জিনিসে।

কারো কাছে ঋণী নয়
তবু বলে, ঋণী সে,
ভুল করে চায়ে নুন
দেয়, ভেবে চিনি সে।

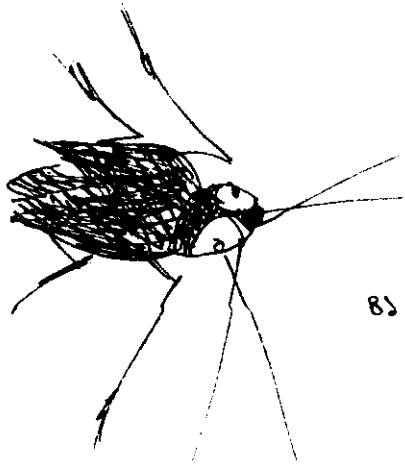

তফাতটা বোঝে না তো
তুই, তুমি, তিনি, সে।
বিছানায় শুয়ে লাফ
দেয়, প্রতিদিনই সে।

মার্কেটে গিয়ে শুধু
করে কিনি কিনি সে।
স্বপ্নের ঘোরে রোজ
যায় নিউগিনি সে।

## অভাগা

এই ছেলে নাম কীরে?
—নরহরি কান্ত।
: করিস কী রাত দিন?
—চলি উদ্‌ভ্রান্ত।

: বাবা বুঝি বেঁচে নেই?
—মরে গেছে আকালে।
: আহা খুব মায়া হয়
তোর দিকে তাকালে।

: তবে তোর মা কোথায়?
—তা তো ঠিক জানি না!
: এটা কোনো কথা হলো?
—তোর কথা মানি না।

: ভাইবোন আছে নাকি?
—ছিল, তবে আজ নেই।
: থাক বাবা তোর সাথে
কথা বলে কাজ নেই!

## লুকুচুলি

'ভোল্ হ'ল দোল খোল'
খুকু পলে বই।
আমি দাকি পুছি তুই
কই গেলি কই!

পুছি কয় মিঁউ মিঁউ
খেলি লুকুচুলি।
ছত্যি এ পুছিটাল
নেই কোনো জুলি।

## দাওয়াই

এই ছেলেটা কেমন দেখ ডাঙ্গ করে আর হাঁটে
অমিতাভের মতোই মাথায় চুলের সিঁথি কাটে।
ভাবখানা এই তার জুড়ি নেই সে ফিলিমের হিরো
হাল ফ্যাশনের প্রতিভূ সে, লেখাপড়ায় জিরো।
কথায় কথায় হিন্দি বাতায়, যাইকে বলে যানা
মস্তকে তার ভর করেছে হিন্দিভূতের ছানা।
হাত পা নেড়ে কাভি কাভি হিন্দিতে গায় গানা—
হাম কিসিসে কম নেহি হ্যায় কুছ নেহি পরোয়ানা।

কেমনতরো অসুখ এটা? মাতৃভাষা ভুলে
হিন্দি ভাষায় বলছে কথা, গাইছে পরান খুলে!
এমন রোগের চিকিৎসা কী? উপশমের দাওয়াই?
চল তাকে পাবনা জেলার ঘাস-বিচালি খাওয়াই।

## পিতা-পুত্র সংবাদ

'ছেলেদের চাইতে কি বেশি থাকে বাবাদের বুদ্ধি'?
সাত বছরের ছেলে এমন প্রশ্ন করে!
বিপাকেই পড়ে সলিমুদ্দি।
চোখ দুটো পাকিয়ে
মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে
বাবা বলে, 'ঠিক ঠিক ঠিক রে,
বড়দের ধরে ধরে
এভাবে প্রশ্ন করে
দুনিয়ার সবকিছু শিখরে।'
বলে সলিমুদ্দি—'ছেলেদের চেয়ে বেশি বাবাদের বুদ্ধি!

ছেলে নাচে ধিন ধিন—
'বাষ্পীয় ইঞ্জিন
বলো তো কে করেছে আবিষ্কার?'

বাবা বলে—'জান না তা? নাম তার জেমস্ ওয়াট,
পেয়েছে সে অনেক পুরস্কার।
জেমস্ ওয়াট কোনোদিন কারো কাছে হারেনি।'

ছেলে বলে—'জেমসের বাবা ছিল বুদ্ধু, ইঞ্জিন বানাতে সে পারেনি!'

## টাক দিয়ে যায় চেনা

এক যে ছিল কাক—
হঠাৎ করেই কাকের মাথায়
পড়তে থাকে টাক।

কাকটা ভাবে হায়
টাক নিয়ে এই কাক সমাজে
প্রেস্টিজ যায় যায়!

কদিন বাদে বিয়ে
সমস্যাতেই পড়ছে কাক
চকচকে টাক নিয়ে।

সবার নজর এখন কেবল
কাকের টাকের দিকে
নাকের জলে চোখের জলে
থাকতে হচ্ছে টিকে।

সেদিন সকালবেলা—
উঠোন জুড়ে রোদ্দুরে কাক
করছিল ভাই খেলা।
এমন সময় ঘটক এসে
বলল, ও কাক ভাই—
টাকের খবর জানতে দেখি
কারোই বাকি নাই!

টাকের খবর রটাল কোন
হতচ্ছাড়া পাজি?
টেকো বরকে কন্যে দিতে
হচ্ছে না কেউ রাজি।

কাকটা ভাবে হায়
টাকের জন্যে এখন দেখি
বিয়ে করাই দায়!
কাকটা তখন লজ্জা পেয়ে উড়ল আকাশমুখী
বুঝল সে যে, পৃথিবীতে টেকোরা খুব দুখী।
টেকো মাথায় চুল গজাবে কোন সে ওষুধ খেলে?
চিকিৎসা এর হতেও পারে রাজধানীতে গেলে।

কাকটা এল ঢাকা
হরেক রকম সাইনবোর্ড সব ঝুলিয়ে যেথায় রাখা।

ফকিরাপুল এসেই সে কাক করল শুরু গানা
ঐ দেখা যায় 'টাকেশ্বরী টাকুয়া দাওয়াখানা'!
দাওয়াখানার হেকিম সাহেব মস্তকে তার টাক
দেখে অবাক কাক!

বিস্তারিত শোনার পরে হেকিম বলল—দাদা
টাকের কদর যে করে না সে আদতে গাধা।
টাক মানেই তো টাকা
পরচুলাতে বৃথাই সে টাক আড়াল করে রাখা।
ইচ্ছেমাফিক মস্তকে টাক গজানো যাবে না।
টাকের আমি টাকের তুমি টাক দিয়ে যায় চেনা।

কাক খুশিতে কাকুম কুকুম, কাক খুশিতে কা-কা
এই না হলে ঢাকা!

## একদিন ঘুড়ি হয়ে

ঘুড়িরা ভীষণ দুষ্টু, আমি
কী যে করি! ধুত্তুরি!!
ঘুড়ির সঙ্গে উড়ি আমি রোজ
ঘুড়ির সঙ্গে উড়ি।

কোনো ঘুড়ি নীল, কোনোটা সাদা
কোনো ঘুড়ি বর্ণিল,
বেগুনি হলুদে গোলাপি সবুজে
আকাশটা ঝিলমিল।

পড়ার টেবিলে মন বসে নাকো
বসে থাকি জানালায়,
ঘুড়ি ডাকে—আয় আয়...
ঘুড়ি বলে—খোকা উড়বি?
আকাশের পথে ঘুরবি?
বই-টই ফেলে রাখ না
না থাকুক ডানা পাখনা!

আমাদের সাথে আয় রে—
উঁচুতে আকাশে পাক খেতে খেতে
কী যে মজা পাওয়া যায় রে!
সাঁই সাঁই করে ছুটবি,
রংধনু হয়ে ফুটবি।

সুতোয় লাগিয়ে মাঞ্জা
মজবুত রেখে পাঞ্জা
লাটাই দু'হাতে বাড়িয়ে—
রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে—
ঘুড়ি হয়ে উড়ি উড়ে উড়ে ঘুরি
গানে গানে ঘুরি সুরে সুরে ঘুরি
কাছে কাছে ঘুরি দূরে দূরে ঘুরি
মেঘের সীমানা ছাড়িয়ে।

মায়ের বকুনি বাবার শাসন
টিচারের বাধা মাড়িয়ে
জেনো একদিন—প্রিয় বন্ধুরা,
ঘুড়ি হয়ে যাব হারিয়ে।

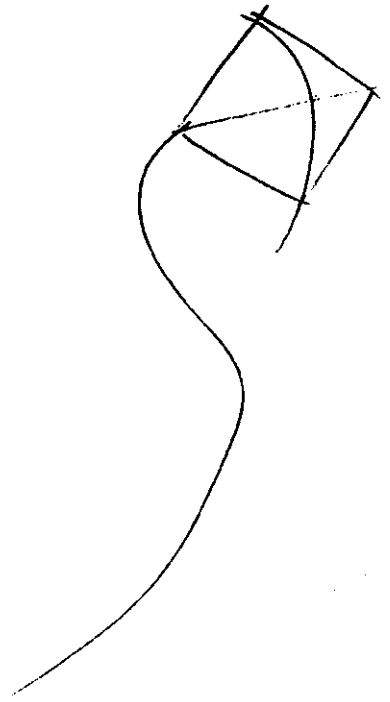

## গুডবাই

হাঁ-হাঁ-হাঁচ্-চি
বিরিয়ানি খাচ্ছি।
চিকেন না কাচ্চি?
সামনে যা পাচ্ছি।
দু'গেলাস লাচ্ছি
খেয়ে দিই হাঁচ্চি।

হাঁ-হাঁ-হাঁ-চ্-চি
গুডবাই, যাচ্ছি।

## দ্বিতীয় পর্ব ■ কিশোর কবিতা

## সূচিপাতা

শার্লীকে লেখা চিঠি ৪৯
তোমার আমার ৫০/ আলোর পিদিম ৫১
একুশের ছড়া ৫২/ আমার তাতে কী ৫২/ ঈদের দিনে ৫৩
টোকাই ৫৩/ বালক জানে না ৫৪/ পথের পাঁচালি ৫৫/ আজকের ছড়া ৫৬
আবার আসিবে ফিরে এই বাংলায় ৫৭/ কাজের মেয়ে ৫৮
জয়নুল আবেদিন ৫৮/ মানুষের অধিকার ৫৯
খোকন ফিরে আয় ৬০/ সংলাপ ৬২/ যখন তখন ৬৩/ শহীদ মিনার জানে ৬৪

# শার্লীকে লেখা চিঠি

শার্লী তোকে লিখছি যখন চিঠি
দূর আকাশে তারার মিটিমিটি।
ল্যাম্পোস্টের থমকে থাকা আলো
বলছে, রিটুর শার্লীমণি ভালো।

আচ্ছা, তোকে সেই দেখেছি কবে
করলে হিসেব বছর চারেক হবে।
তখন তো তুই এত্তুটুকুন ছিলি
তোর চুলে মা কাটত ব'সে বিলি।
এখন বুঝি খুব হয়েছিস বড়?
শার্লী তুমি কোন্ কেলাসে পড়?
ধুত্তরি ছাই, তুই তো নয়, তুই
আত্মভোলা মনটা কোথায় থুই!

তুই লিখেছিস ঠিক পাঠিয়ে দিতে
ববিক্লিপ আর কমলা রং ফিতে।
পারলে কিছু টুকরো কাপড় সুতো
নইলে দিবি গাট্টা মেরে গুঁতো।

বাপরে! এটা দস্যি মেয়ে কী যে
চিঠির ভেতর শাসিয়ে দিল নিজে!
ছোট্ট মতোন বাকসোটা তোর আছে?
রাখতি যেটা কেবল কাছে কাছে?
যার ভেতরে পুতুল পাখি আর—
বালিশ কাঁথায় সাজাতি সংসার!

তোর ছবিটা রেখেছি এ্যালবামে।
ডানদিকে তুই, আমার ছবি বামে।
ছবির পাশে ছোট্ট করে লেখা
শার্লীমণি, কখন হবে দেখা?

খুব লিখেছি। আজ তাহলে রাখি
ঘুমুতে যাও, বলছে রাতের পাখি।
জলদি করে চিঠির জবাব দিস
তোর জন্যে রইল শুভাশিস।

## তোমার আমার

তোমার ঘরে সুখ-পাখিটার
কেবল আনাগোনা,
আমার এ ঘর ব্যথায় মলিন
দুখের জালে বোনা!
তোমার বাবা সোফায় বসে
ফ্যানের হাওয়া খায়,
আমার বাবা দিন রাত্তির
কেবল খেটেই যায়!
তোমার মায়ের সোনার হাতে
সোনার কাঁকন বাজে,
আমার মায়ের দিন কেটে যায়
সাহেববাড়ির কাজে!
তোমার বোনের শিফন শাড়ি
খুশির হাওয়ায় ওড়ে,
আমার বোনের নাম সখিনা
পথে পথেই ঘোরে।
তোমার ভাইয়ের কত্ত মজা
চালায় কাঠের ঘোড়া,
ভাইটা আমার পায় না খেতে
এমনি কপাল পোড়া!
তোমার বাড়ির কুকুরটারও
কত্ত খাবার জোটে,
আমরা সবাই উপোস করি
পাই না খেতে মোটে!

# আলোর পিদিম

এক যে ছিল ঝাঁকড়া চুলের শান্তশিষ্ট ছেলে
নীল আকাশে সবুজ বনে উড়ত ডানা মেলে।
বলতে পার পরী সে নয় কোথায় পেল ডানা
কিন্তু ছেলের ডানার কথা সবার ছিল জানা।

মনের ডানায় ভর করে সে উড়াল দিত দূরে
উদাস হতো রাখাল ছেলের স্নিগ্ধ বাঁশির সুরে।
পাখির পালক রোদ লেগে হয় আলোর ঝিকিমিকি
সেই ছেলেটার মুগ্ধ চোখে পড়ত ধরা ঠিকই।

রুপোলি মাছ ঝলসে ওঠে দুপুর রোদে, জালে
সেই ছেলেটা নৌকো চালায় ঢেউয়ের দোদুল তালে।
সেই ছেলেকে হাতছানি দেয় সবুজ বনভূমি—
'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।'

হঠাৎ করে করুণ সুরে উঠল ডেকে পাখি
হিংস্র ভয়াল জন্তু এল জড়িয়ে পোশাক খাকি।
রক্ত খেকো দত্যি এল আঁধার ঘেরা রাতে
কাজল মাটির দেশের মানুষ ভয় পেয়ে যায় তাতে।
রাত দুপুরে শব্দ বুটের চারিদিকে সন্ত্রাস
এক নিমেষে লাল হয়ে যায় সবুজ বরণ ঘাস।

ঝাঁকড়া চুলের সেই ছেলেটা ভাবতে থাকে শুধু
বুকের মাঝে কষ্ট যেন বিরানভূমি ধু-ধু!
এই যে আকাশ এই যে পাখি এই যে আমার নদী
রূপ ঝলমল স্বপ্ন হয়ে বইছে নিরবধি
সোনায় মোড়া এদেশ আমার তোমার বুকে চুমি—
'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।'

ঝাঁকড়া চুলের সেই ছেলেটা হঠাৎ বীরের সাজে
ঝাঁপিয়ে পড়ে কী ভয়ানক জন্তুগুলোর মাঝে।
জন্তুগুলো লুটিয়ে পড়ে, লুটিয়ে পড়ে ছেলে
সবুজ ঘাসে টুকটুকে লাল আলোর পিদিম জ্বেলে।

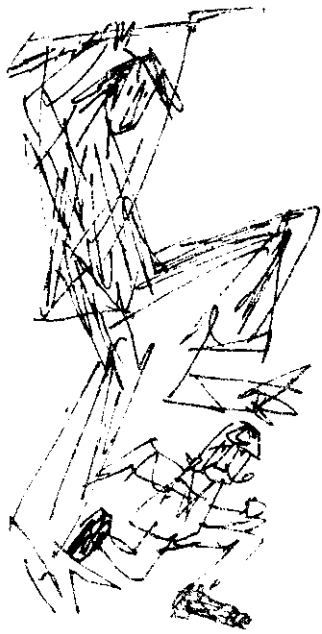

## একুশের ছড়া

চাইল নিতে কেড়ে
মায়ের মুখের বুলি
খোকা এল তেড়ে
অমনি খেল গুলি।

খোকার প্রাণের দামে
পেলাম ভাষা ফিরে
তাই সে খোকার নামে
একুশ আছে ঘিরে।

## আমার তাতে কী

আমি জানি হেমিংওয়ে হোমার
আত্মীয় হয় তোমার।
আমি জানি লিও টলস্টয়
তোমার খালু হয়।
আইনস্টাইন গ্যাটে নিউটন
তোমার আপনজন।
বন্ধু তোমার গোর্কি ও জয়নুল
নেই যে তাতে ভুল।
আমি জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বন্ধু তোমার কাকুর।

আমার তাতে কী?
আমি শুধু তোমার মাঝে
তোমায় দেখেছি।

## ঈদের দিনে

ঈদের দিনে মনে রেখ তাকে...
বস্তিপাড়ার ন্যাংটো ছেলেটাকে।
পরনে তার নেইকো নতুন জামা
উদোম গায়ে দেয় সে কেবল হামা।
খিদের জ্বালায় সেই ছেলেটা কাঁদে
ওদের মা কি ঈদের সেমাই রাঁধে?

ঈদের দিনে মনে রেখ তাকে...
বস্তিপাড়ার ছোট্ট মেয়েটাকে।
পরনে তার নেইকো নতুন ফ্রক
তারও ঈদের ফিরনি খাওয়ার শখ।
এলোচুলে বাঁধে নি লাল ফিতে
একটু যদি ওদেরও ভাগ দিতে...

কাল তো খুশির ঈদ
সেই খুশিতে তোমার বুঝি
নেইকো চোখে নিদ?
তোমার চোখে ঘুম-পরী দেয়
আলতো করে চুম।
কিন্তু ওদের? খিদের জ্বালায়
পালিয়ে গেছে ঘুম।

## টোকাই

বুকের মাঝে ব্যথার আগুন
মনের মাঝে দুঃখ
মুখ ফ্যাকাসে নেইকো হাসি
চুলগুলো সব রুক্ষ।

একাত্তরে বাপ হারালাম
মা গেল দুর্ভিক্ষে
উপোস করি হাত পাতি না
নেই না কারো ভিক্ষে।
কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা
শক্ত হাতের মুষ্টি
প্রাপ্য আমার পাই নি কিছুই
নেই মনে সন্তুষ্টি।

খিদেয় পেটে আগুন জ্বলে
দেখতে কি কেউ পাও না?
সোনার দেশের টোকাই আমি
চাইছি নিজের পাওনা।

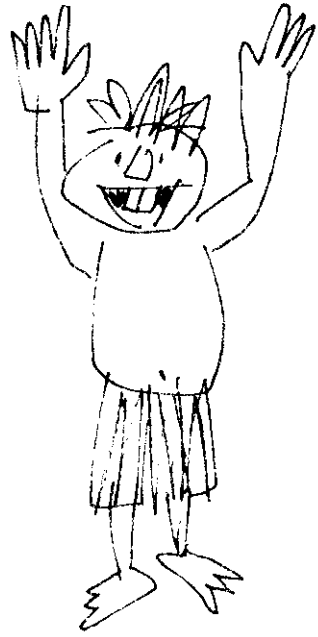

## বালক জানে না

বালক জানে না কী যে ওর অপরাধ
ধুলোয় লুটাল সকল স্বপ্ন-সাধ।
নৃশংস আর অমানুষ মিলিটারি
জলপাই রং ভয়ানক জিপ গাড়ি
উলোটপালোট করে দেয় অলিগলি,
ছলোছলো চোখে সেই কথা আজ বলি।

কোলাহল আর শব্দমুখর ঢাকা
চোখের পলকে মৃত্যুনগরী, ফাঁকা।
নিজ বাসভূমে বন্দি মানুষগুলো
দেখে না আকাশে সাদা মেঘ-পেঁজাতুলো।
আকাশে কেবল বারুদ ধূসর ধোঁয়া
নিমেষে উধাও মানবিকতার ছোঁয়া।

বালক জানে না যুদ্ধের কোনো মানে
সে সাদা পায়রা আকাশে ওড়াতে জানে।

অথচ হিংস্র বর্বর পাকসেনা
চুকিয়ে দিয়েছে জীবনের লেনাদেনা।
পিচঢালা পথ রক্তে গিয়েছে ভিজে
একাত্তরের সেই ছবি ভুলি নি যে!

বালক কখনো ফেরে না পেছন টানে,
ওরাই দেশের স্বাধীনতা কিনে আনে।

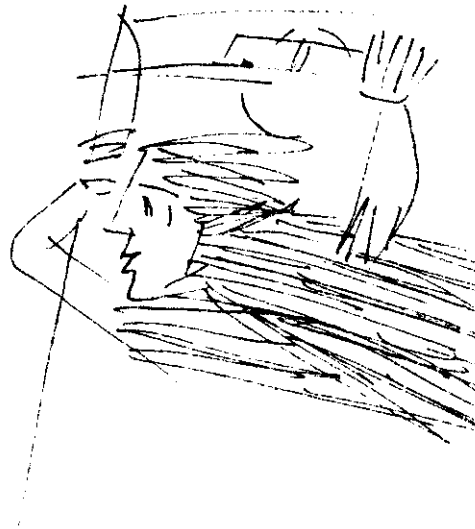

## পথের পাঁচালি

একাত্তরে যুদ্ধে গেল বাপ
আমি তখন কোলে,
স্নিগ্ধ আমার মায়ের চোখে
স্বপ্ন রঙিন দোলে—
স্বাধীন হবে মাটি
সেই মাটিতে খেলব আমি
বিছিয়ে শীতল পাটি।
বাপের সাথে মায়ের সাথে
করব হাঁটাহাঁটি।

মায়ের চোখের স্বপ্ন হলো খুন।
ফিরল না আর বাপ,
মা যে আমার আঁধার রাতে
গাঙেই দিল ঝাঁপ।
স্বাধীন হলো মাটি
তার ওপরে শুরু আমার
একলা হাঁটাহাঁটি।
কেউ বিছিয়ে দেয় নি আমায়
সেই সে শীতল পাটি।

অনাহারকে সঙ্গী করে
ঘৃণা অপমানে—

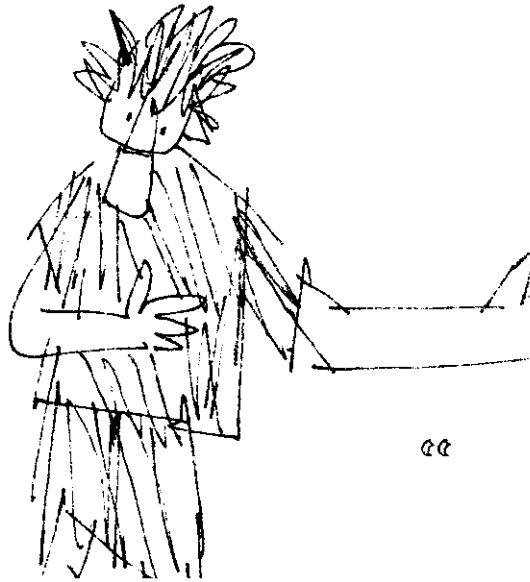

আমার বেড়ে ওঠার কথা
কেউ তোমাদের জানে?

আমার শরীর বস্ত্রবিহীন
হাতে শূন্য থালা
বুকে আমার বেঁচে থাকার জ্বালা।
এক জীবনে শেষ হবে না
আমার দুখের পালা।

ঘুম আসে না আমার পোড়া চোখে।
সাক্ষী আকাশ। চাঁদও।
ভোরের হু হু বাতাস এসে
আমায় বলে—কাঁদ।

পথের মানুষ ব্যস্ত মানুষ
চায় না আমার দিকে,
খিদেয় আমার চোখের জ্যোতি
যায় হয়ে যায় ফিকে।

কোথায় আমার বাবার কবর?
কোথায় মায়ের লাশ?
দেয় না জবাব মানুষ-পাখি
আকাশ-নদী-ঘাস।

তোমরা আমায় এই শহরের
আবর্জনা বল,
আমার দুচোখ তাই তো ছলোছলো!

## আজকের ছড়া

একদল ছেলে আছে, একদল মেয়ে
ওরা কেউ ভালো নেই আমাদের চেয়ে।
পথে ওরা বেড়ে ওঠে পথেই ঘুমায়
কেউ খোঁজ রাখি নাকো খায় কি না খায়।

কাছে গিয়ে বলি নাকো—কী খবর? ভালো?
জীবন আঁধার নাকি চকচকে আলো?
লেখাপড়া চলছে তো? ইশকুলে যাও?
ভিসিআর-এ প্রিয় ছবি দেখতে কি পাও?
এই ঈদে পেয়েছ তো ঝলমলে জামা?
বাবা কিনে দিল? নাকি, কিনে দিল মামা?
চোখ কেন ছলোছলো? বকেছে কি কেউ?
ছোট্ট এ বুকে কেন কষ্টের ঢেউ?

আজকে খুশির দিনে চল গিয়ে বলি—
তোমরা টোকাই নও, নও পথকলি,
আমাদেরই বোন আর আমাদেরই ভাই
আজকের এই দিনে সে কথা জানাই।

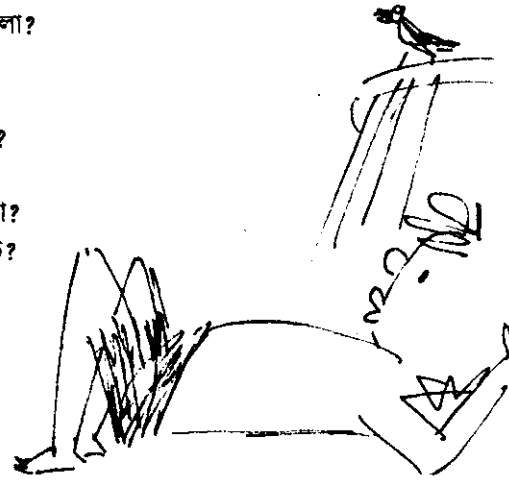

## আবার আসিবে ফিরে এই বাংলায়

শহীদ জননী তিনি, জান তাঁর নাম?
ইতিহাসে তাঁর কথা লিখে রাখলাম।
জাহানারা ইমামের মৃত্যুতে শোক
শোক আজ শক্তিতে পরিণত হোক।

বেঁচে থাকা জাহানারা ইমামের চেয়ে
মৃত জাহানারা আসে শতগুণে ধেয়ে।
প্রতিধ্বনিত হয় তাঁরই হুংকার
ঘাতক দালাল কাঁপে, কাঁপে রাজাকার।
এই দেশ এই মাটি নদী পাখি ফুল
জাহানারা ইমামের জন্যে আকুল।
ঘরে ঘরে জাহানারা মশাল জ্বালায়—
আবার আসিবে ফিরে এই বাংলায়।

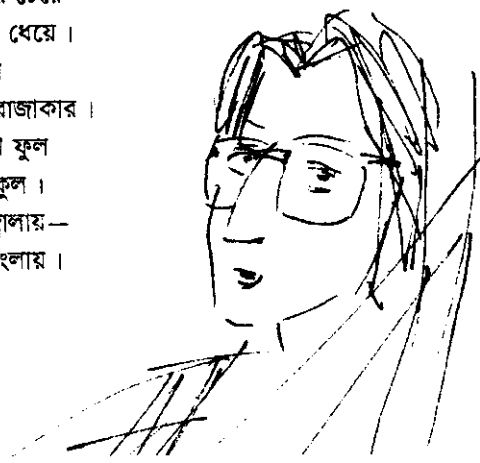

## কাজের মেয়ে

যায় না পাওয়া কাজের মেয়ে
কাজের মেয়ের অভাব আছে
তার পরেও গিন্নিগুলোর
নির্যাতনের স্বভাব আছে।

পান থেকে চুন খসলে পরে
ভাগ্যে জোটে পিঁড়ির বাড়ি
হোক না মধ্যবিত্ত কিংবা
মোজাইক করা সিঁড়ির বাড়ি।

সব বাড়িতেই কাজের মেয়ের
একই রকম লাঞ্ছনা যে,
আমার কথায় ডিফার কর?
আমার কথা মানছ না যে!

তাকাও নিজের বাড়ির দিকে
কাজের মেয়ে ভালো আছে?
ওর দু'চোখে কান্না ছাড়া
স্বপ্নমাখা আলো আছে?

## জয়নুল আবেদিন

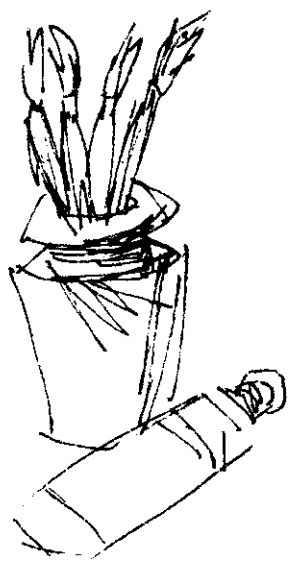

তিনি এই বাংলার শিল্প-আচার্য
শিল্পের ব্যাখ্যায় তিনি শিরোধার্য
করেন নি ভেদাভেদ আর্য-অনার্য
সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর জীবন ও কার্য।

এই দেশ এই মাটি-ফুল-নদী-পাখিতে
ভালোবাসা প্রীতি-স্নেহ-মায়া মাখামাখিতে
শেকড়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতে
নিয়োজিত থেকেছেন তিনি আঁকাআঁকিতে।

গুণটানা, বিদ্রোহ, রমণী ও বৃক্ষ
কালো কাক, সংগ্রাম, লাশ, দুর্ভিক্ষ
ছোট বড় ক্যানভাসে কী গভীর মমতায়
এঁকেছেন অপরূপ জাদুকরী ক্ষমতায়।
তাঁর ছবি আমাদের মেধা আর মননে
সততই জেগে থাকে শত অনুরণনে।

এভাবেই কেটে যাবে রাত, কেটে যাবে দিন
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিন জয়নুল আবেদিন।

## মানুষের অধিকার

মানুষের অধিকার কেড়ে নেয় মানুষেরা
মানুষ কি মানুষের জন্য?
মুখোশের আবরণে একাকার, বোঝা দায়
কে মানুষ, কে যে পশু, বন্য।

মানুষেরই ভয়ে ভীত সাধারণ মানুষেরা
যুগে যুগে থাকে সন্ত্রস্ত

মানুষেরা মানুষের শ্বাসরোধে সুনিপুণ
প্রসারিত করে রাখে হস্ত।
মানুষেরা মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়
অধিকার কেড়ে নিতে দক্ষ
হিংস্র দানব নয় মানুষেরা মানুষের
রক্ত পিপাসু প্রতিপক্ষ।

বর্ণে বর্ণে আর গোত্রে গোত্রে চলে
রক্তের হোলি খেলা কর্ম
মানুষই চাপিয়ে দেয় মানুষের দেহ মনে
আবলুশ ধর্মীয় বর্ম।

মানুষের অধিকার মৌলিক অধিকার
মানুষেরই হাতে হয় ক্ষুণ্ণ
পৃথিবীর মানুষেরা, ভালোবেসে ভালোবেসে
ভুলে যেতে চাই পাপ-পুণ্য।

# খোকন ফিরে আয়

(১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের
ছাদ ধসে নিহত বন্ধুদের উদ্দেশে)

সেই যে খোকন বেরিয়ে গেছে আর ফেরে নি ঘরে
থেকে থেকে মনটা মায়ের কেমন কেমন করে।
পড়ার টেবিল থমকে আছে উলোটপালোট বই
বন্ধু ওদের না জানিয়ে পালিয়ে গেল কই?

'কাজ ওঠে না দুখিনী মা'র হলুদ মাখা হাতে
বাবার সাথেও কয় না কথা গোস্বা বাবার সাথে।'
মায়ের শাড়ির আঁচল ধুলোয় গড়াগড়ি খায়
কই গেলি রে সোনার খোকন আয় না ফিরে আয়।

সেবার চিঠি লিখেছিল সোনার বরণ ছেলে—
প্রণাম নিও, আসব মাগো পুজোর ছুটি পেলে।
আয়েস করে পায়েস রেঁধে বানিয়ে শখের নাড়ু
সকাল বিকেল মা কেবলি আঙিনা দেয় ঝাড়ু।
কাজের ফাঁকে উদাস চোখে খোকার পথের দিকে
তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের জ্যোতি হলো ফিকে।
সূয্যি ডোবে, সন্ধ্যা নামে, রাত পেরিয়ে ভোর
মা ফুপিয়ে কাঁদে, 'খোকন, কী হয়েছে তোর?'

মা লিখেছে ছোট্ট চিঠি ঢাকায় খোকার কাছে—
'তোর পাঠানো রুপোর বালা ট্রাংকে রাখা আছে।
জানিস আমি পরব ওটা দুর্গা পুজোর দিনে
আমার জন্যে আনবি কিন্তু সিঁথির সিঁদুর কিনে।
সময় মতো খাস তো বাছা? চিঠির জবাব দিস
তোর জন্যে অনেক আদর, রইল শুভাশিস।'

চিঠির জবাব দেয় নি খোকন হতচ্ছাড়া পাজি
মায়ের মনে কষ্ট দিতে সব সময়ই রাজি।
নাওয়া খাওয়া সব ছেড়েছে কিচ্ছু বোঝে না মা
আলনাতে ভাঁজ করে রাখে খোকার প্রিয় জামা।

খোকার জুতোর ধুলো ঝেড়ে সাজিয়ে সারি সারি
জিনিসপত্র গুছিয়ে মা সাজিয়ে রাখে বাড়ি।
'সাজানো গোছানো খোকা বড্ড ভালোবাসে'
জানলা রাতে খোলাই থাকে, খোকন যদি আসে!

হুক্কা হাতে দাওয়ায় বাবা একলা বসে থাকে
ঢাকায় গিয়ে চিঠি লিখিস বলবে যে আর কাকে!
উঠোন দিয়ে হাঁটলে পরে পাশের বাড়ির সাকি
বাবার শুধু ভুল হয়ে যায়, 'খোকন এলি নাকি?'
এবার পুজোয় সোনামানিক আসবে না উৎসবে
ঢাকায় খোকন পড়তে গেছে, জজ-ব্যারিস্টার হবে!

বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদছে শুয়ে দিদি—
আমার দাদার ভাগ্যে এমন মরণ ছিল বিধি!
দিদির জন্যে কে পাঠাবে টুকটুকে লাল ফিতে?
সবুজ খামে লিখবে কে আর সুখের পরশ দিতে—
'ছুটিয়ে ঘোড়া টগবগিয়ে আসবে রে তোর বর
তখন দিদি আমাকে তুই করবি নাতো পর?
তখন কি আর বলবি আমায় দুষ্টু পাজি গাধা?
আমি যে তোর দাদা হই রে, আমি যে তোর দাদা।'

দিদির বুকের কষ্টগুলো কান্না হয়ে ঝরে
ছোট্টবেলার দাদার স্মৃতি আবছা মনে পড়ে।

'খোকন খোকন কোথায় গেলি, খোকন ফিরে আয়'
দুখিনী মা ডুকরে কাঁদে দাঁড়িয়ে আঙিনায়।
দূরের মাঠে উথালপাথাল বইছে বাতাস ধু-ধু
আজ বাতাসে কিসের শব্দ? শোকের মাতম শুধু।
শোকের ছায়া নামল বুঝি শহর থেকে গাঁয়—
কই গেলিরে সোনার খোকন আয় না ফিরে আয়!

বাবলা গাছে সেই সে পাখি দোয়েল বুঝি নাম
মিষ্টি সুরের গান ভুলে সে কাঁদছে অবিরাম।
এলোকেশী মায়ের বিলাপ, খোকন ফিরে আয়—
বিলাপ শুনে দূরের আকাশ মেঘলা হয়ে যায়!

## সংলাপ

প্রথম ■ তুমি অত নোংরা কেন, ছি!
চুলগুলো সব এলোমেলো
শ্যাম্পু মাখ নি!
ছেঁড়া একটা প্যান্ট পরেছ
উদোম তোমার গা,
হালফ্যাশনের একটা শার্ট কি
কিনতে পার না?

খালি পায়ে বেড়াও হেঁটে
লজ্জা তোমার নেই,
আমার পুরোন একজোড়া কেডস
তোমায় দিয়ে দেই?
চাইলে তুমি নিতে পার
অনেক কিছুই, তবে—
একটা শর্ত, তোমায় আরো
ফর্সা হতে হবে।
কালো আমার ভাল্লাগে না মোটে।

দ্বিতীয় ■ আমি খুশি, একটুকরো
সাবান যদি জোটে।
শ্যাম্পু কী দরকার?
উৎসব নেই আনন্দ নেই
জামাও নেই যার—
ফ্যাশন-ট্যাশন তার কি মানায়?
তুমিই বল ভাই,
আমি কেবল লজ্জা ঢাকতে
একটু কাপড় চাই।

না হোক নতুন, পুরনো হোক
হোক না সেটা ছেঁড়া,
জীবন আমার জোড়াতালির
অশ্রু দিয়ে ঘেরা।
কী আনন্দ খালি পায়ে

হেঁটে যেতে যেতে
আমার মতো হাঁটলে তুমি
মাটির পরশ পেতে।
ভাবছ তুমি গায়ের রংটা
ফর্সা হলেই ভালো?
আমি কালো বলেই তুমি
ঝলমলানো আলো।

তোমার কাছে চাই না কিছুই
তুমি থাক সুখে,
বুঝবে মজা আমরা যেদিন
দাঁড়াব সব রুখে।

তোমারগুলো আমার হবে
আমারগুলো তোমার,
শুনতে পাচ্ছ? ঐ তো শব্দ
মিছিল মিটিং বোমার।

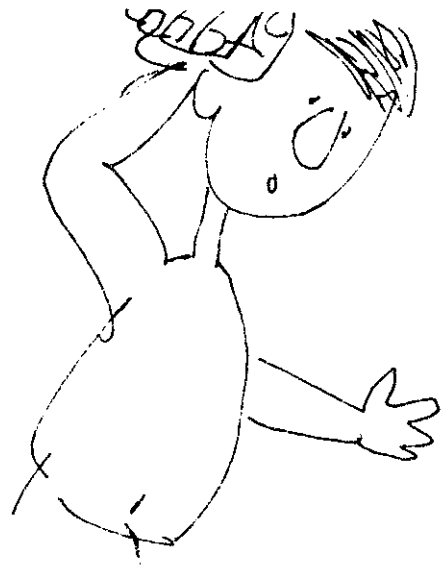

## যখন তখন

দুপুরবেলা খিদেয় কাঁদে
যখন আমার বোন
তখন তোমার বোনটা খুশি
পেয়ে বাবার ফোন।

সকালবেলা মিষ্টি সাজে
যখন আমার ভাই
ভাইটা তোমার ইশ্‌কুলে যায়
ঝুলিয়ে গলায় টাই।

রাতের বেলা রিক্‌শা চালায়
যখন আমার বাবা
তোমার বাবা ড্রয়িং রুমে
খেলেন তখন দাবা।

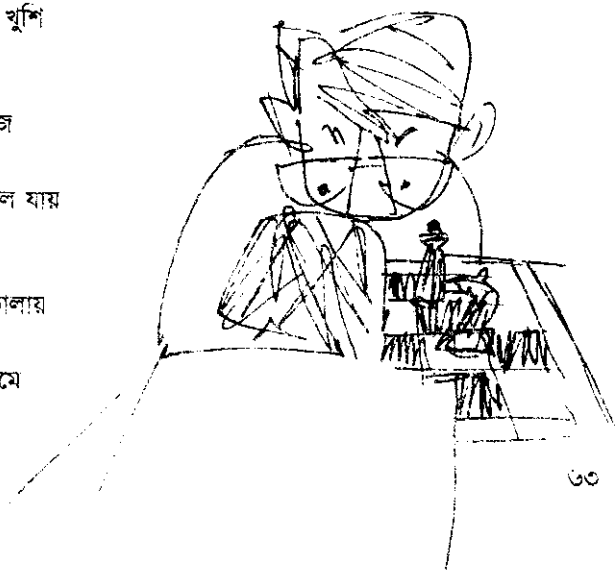

বিকেলবেলায় আম্মু তোমার
মার্কেটিঙে যায়
পাশের বাড়ি বাসন মাজে
তখন আমার মায়।

## শহীদ মিনার জানে

বলল খোকন—লক্ষ্মী মাগো
কান্না ভুলে থাক,
তোর এ খোকন আসবে ফিরে
দুয়োর খুলে রাখ।

আঁচল দিয়ে দু চোখ মুছে
মা বলল—সোনা,
দ্যাখ মিছিলে কত্ত মানুষ
যাচ্ছে না তো গোনা!

মিছিল থেকে জলদি ফিরিস
রাত্রি হবার আগে,
আঁধার হলে তোকে ছাড়া
আমার যে ভয় লাগে!

'আসব' বলে আর এল না
মিথ্যেবাদী খোকা,
হতভাগা মামণিকে
এমনি দিল ধোঁকা!

ফাগুন এসে ফিসফিসিয়ে
বলল কানে কানে—
মায়ের খোকন কোথায়, সে যে
শহীদ মিনার জানে।

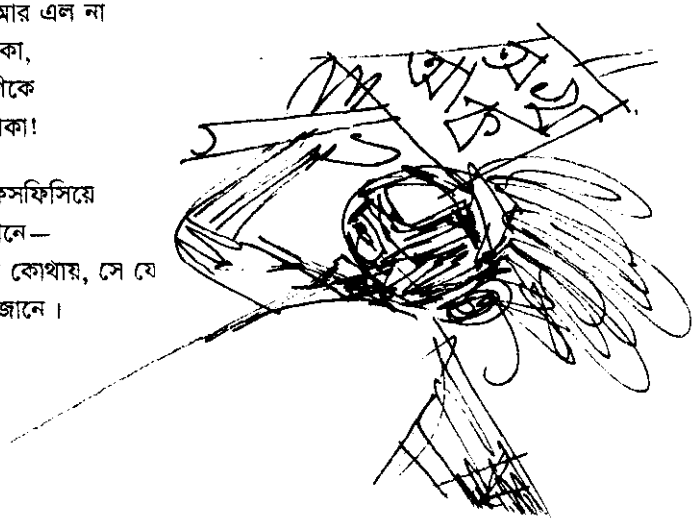

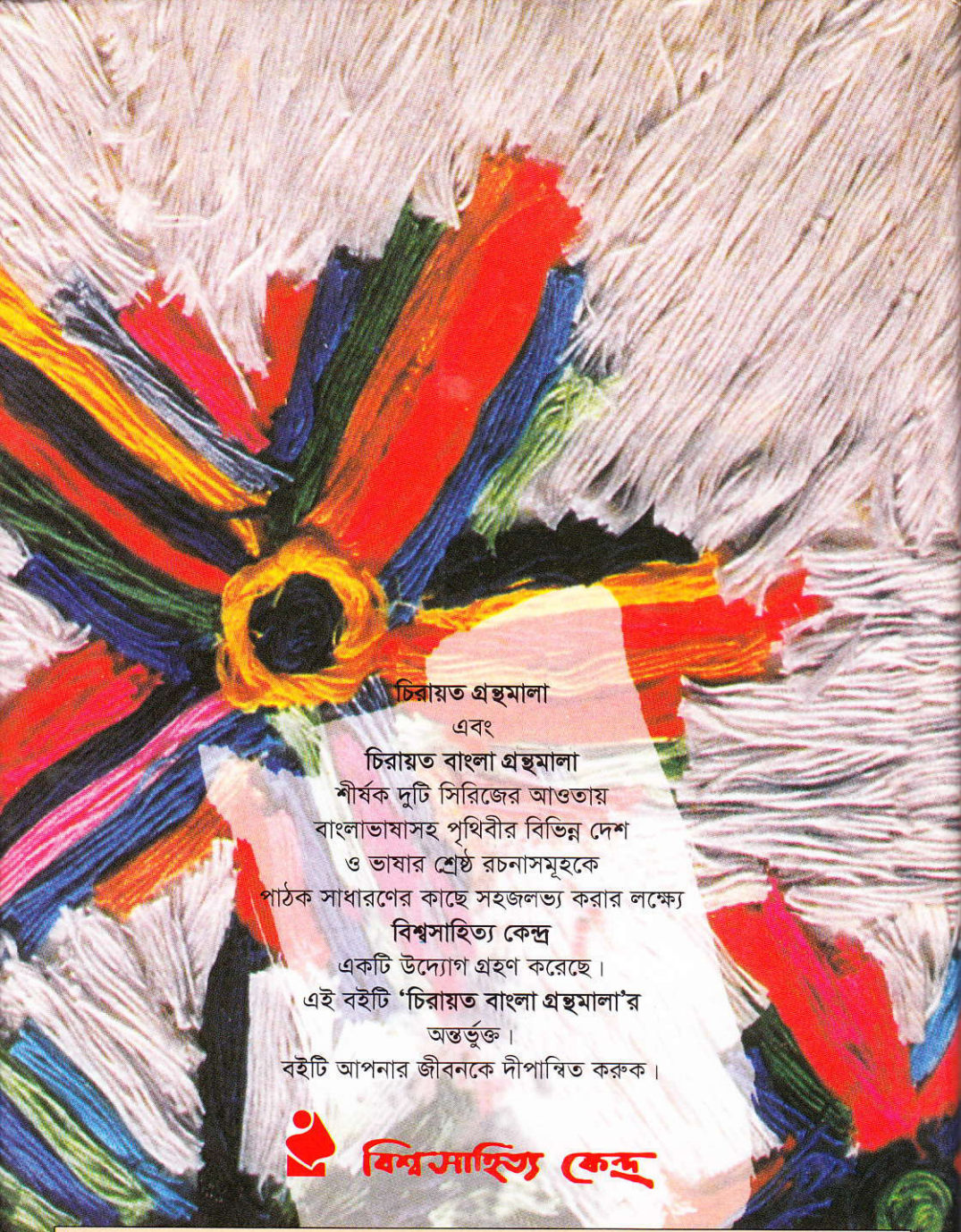

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

গুণগত শিক্ষা উন্নত জীবন
সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।
বিক্রির জন্য নয়